ডেটিনিউ

শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সরস্বতী লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

দাম পাঁচ সিকা

সতী প্রেস লিমিটেড, ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

জেল-বন্ধুদের দিলাম—

—আশ্বিন, ১৩৪৬

'আমিও মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটা সাথী আছেন হিয়া মাঝে,
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে' দেখা।"

বড় একাকী বোধ করিতেছি।

একাকী মানুষ যে এত ভয়ানক তা জানিতাম না। নিজেকে নিজেরই যেন কেমন ভয়াবহ মনে হয়। যে লোক নিজের মধ্যে নিজে আশ্রয় পাইয়াছে, নির্জনতা কেবল তারই লোভনীয় ও সহনীয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষকে মানুষের মাঝ হইতে সরাইয়া আনিলে আমরা মৃতের সামিল হইয়া যাই। নির্জনতা ও একাকিত্বের মধ্যে গেলেই আমাদের অস্তিত্বের দম বন্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, আমা[illegible] সত্তাই হারাইয়া গিয়াছি। এই নিঃসঙ্গ একক অনুভূতি আমার নিকট আ[illegible] নূতন পরিচয় আনিয়াছে।

এ একাকিত্বের পীড়ন হইতে মুক্তি চাই, কিন্তু মুক্তি তো সুলভ নহে। জানিত এজন্য সৌভাগ্য ও সাধনা দুইই থাকা চাই।

শাস্ত্রে নাকি আছে—অগ্রে তিনি একাই ছিলেন, একক নিজেকে সান্নিধ্য দিবার জন্য তিনি সৃষ্টিকে বাহিরে আনিলেন। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হইতে সূতার পর সূতা বাহির করিয়া জাল বুনিয়া থাকে, তিনিও (যিনি অগ্রে একা ছিলেন) নিজের মধ্য হইতে সৃষ্টিটা বুনিয়া বাহিরে আনিতেছেন। তাঁর এই সৃষ্টিকৌশল কবিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, তিনিও জানিতে চাহিয়াছিলেন—"তুমি কেমন করে গান করহে গুণি?"

মনে হয়, আমাদেরও ভিতরে একটা মাকড়সা আছে, সেও জাল বোনে—স্মৃতি ও কল্পনা দিয়া। বিধাতার যাহা সৃষ্টি, আমাদের তাহা কল্পনা। কল্পনা যখন অতীতের দিকে মুখ ফিরায়, তখনই সে স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

বর্তমান হইতে মুক্তির পথ দুদিকে প্রসারিত—একটা গিয়াছে ভবিষ্যের দিকে,

অপরটী গিয়াছে অতীতের অভিমুখে। স্মৃতির পথ ধরিয়া অতীতের দিকে মন তাই বারবার বাহির হইতে চায়—এই একাকিত্ব হইতে মুক্তির জন্ত।

মানুষের ব্যক্তিগত সীমানায় যাহা স্মৃতি, ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় তাহাই অতীত। এই অতীতকে কবি মিনতি করিয়াছেন—

"কথা কও, কথা কও।"

পিছনে ফিরিলে দেখি, সাতবছরের মৃত দিনগুলির দীর্ঘ কঙ্কালশ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। জেলখানায় এই দিনরাত্রিগুলির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। এই প্রেতদিবসগুলির উদ্ধার কেমন করিয়া হইবে? কঙ্কালকে কথা কহাইতে পারেন, সে শবসাধক সন্ন্যাসী কি আমাদের মধ্যে আছেন? আমরা শুধু পারি কবরের ধারে বসিয়া কাঁদিতে, আর পারি বলিতে—"কথা কও, কথা কও।"

কান পাতিলে হয়তো ভিতরে কথা শোনা যায়। কিন্তু কানকে যে বাহির হইতে ভিতরের দিকে ফিরানো দরকার সেজন্ত। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছিলেন—"বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।" ভাগ্যবান ব্যক্তি! ঐ আপন দরজাটার দিকেই বোধ হয়—"মাধব তুয়া অভিসারকি লাগি।" দরজা তো বন্ধ। ঈশ্বরের ছেলে ভরসা দিয়াছেন—knock, কড়ানাড়া দাও; it shall be opened unto you—দেখ, দরজা খুলিল বলিয়া। কিন্তু এ কিসের দরজা? বাসর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া "ওগো বর, ওগো বঁধু"। "পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিদ যাই মনের হরিষে"—ছলনাময়ীর এ কপট নিদ্রা ভাঙ্গাও।

এখন "বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।"

প্রেসিডেন্সি জেল

৬শে আষাঢ়—'৪৪

—ডেটিনিউ

জেলখানা তার কপাট দুইটা খুলিয়া একটা অতিকায় জন্তুর মত তার উদরে আমাদিগকে একদিন গিলিয়া লইয়াছিল। তখন মনে মনে ভরসা ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই উদ্গার করিয়া বাহিরের জিনিষ বাহিরকে ফিরাইয়া দিবে। তখন কে সন্দেহ করিয়াছিল যে, অতিকায় জড় জন্তুটী গিলিতে যত তৎপর গিলিতবস্তু উদ্গারে সেই অনুপাতে ঢিলা ও অনিচ্ছুক। সাত বছর পার হইয়া গেল, মুখটী খুলিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভিতরের জারকরস যত্নের সহিত সারাদেহে মশলার মত মাখাইয়া লইয়া আমাদিগকে সে পরম পরিতোষের সহিত লেহন করিতেছে বৎসরের পর বৎসর। লেহনের মাঝে মাঝে দুএকটা চর্ব্বণও সে দিয়া লয়। বুঝিতেছি, চর্ব্যপর্য্যায়ভুক্ত বস্তু নাই, নতুবা চিবাইয়া শেষ করিতে এতদিন লাগিত না, দুদিনের চুকামড়েই আমাদের খাদ্য-জন্ম ঘুচাইয়া দিত। আমরা আসলে লেহ্য ও চোষ্যজাতীয় জীব, ভিতরে বোধ হয় শক্ত এমন কিছু নাই যাতে চর্ব্বণের প্রয়োজন হইবে।

ভিতরে ঢুকিয়াছি একদিন, সরকারের বদনাম রটাইবার জন্য শত্রুতা করিয়া যদি না মরিয়া যাই, তবে বাহিরে যাইবও একদিন।

কিন্তু সেই ঢুকিবার একদিন, আর বাহির হইবার একদিন—এ দুইটা দিন মিলাইয়া দেখিলেই ধরা পড়িবে—"মা কি ছিলেন, আর কি হইয়াছেন।"

হাতীতে-খাওয়া কয়েতবেলটা বাহ্যতঃ দেখিতে নিখুঁত, কিন্তু ভিতরে নাকি শূন্যকুম্ভইব। আমাদেরও একদিন পুণ্যবল ক্ষীণ হইবে, ভুক্ত কপিথের ন্যায় জেল-স্বর্গের ঐরাবত আমাদিগকে মর্ত্ত্যের মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিবে। আপন জনেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কুড়াইয়া লইবেন, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া মুখ বাঁকা করিবেন, ভাবিবেন,—দুধেজলে-মিশানো পানীয় হইতে দুধটুকু গ্রহণ হইয়াছে দেখিতেছি, স্বর্গ হইতে রক্তমাংসের মানুষটার রক্তমাংস সবই ফেরৎ আসিয়াছে, কিন্তু মানুষটা কোথায়! অতএব—"সে কোথায়, সে কোথায়।" আমরা সরমে মরিব না, প্রাণে যদি তখনও বাঁচিয়া থাকি, তবে চিঁহি চিঁহি গলায় ক্ষীণস্বরে গর্জ্জন করিব—"সে যে আমি, সেই আমি।"

অভিনেতারা একই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু প্রত্যেকের প্রবেশভঙ্গী ও রকমসকম স্বতন্ত্র। ভীম যেমন করিয়া আসরে আসিবেন, তার বড় ভাই যুধিষ্ঠিরও সেই ভাবে আসিবেন—এ কেহ আশা করে না।

আমরা যারা ধরা পড়িয়াছিলাম, তারা সবাই এক স্বভাবের লোক ছিলাম না; আমরা ছিলাম নানামুনির নানামতের মত। আমাদিগকে দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তার বিরাট প্রদর্শনীর একটা বড় অংশই দেখা হইয়া যাইত—এত হরেক রকম, এত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির সমাবেশ ছিলাম আমরা।

আমি জেলে ঢুকিলাম—যেন চুবড়ী হইতে মরা মাছ ক্রেতার থলির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। পরে জানিয়াছিলাম, আমার মত নিরীহ সবাই ছিলেন না। এই জেল-রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন অভিনেতা বিভিন্ন ভঙ্গীতে আগমন করিয়াছেন, যার যেমন রুচি আর কি। একজনের কথা বলি।

লোকটীকে বক্‌স্যাতে গিয়ে দেখি। করাচীর মুসলমান, বয়সে যুবক, নাম বুখারী। অতিশয় চঞ্চল, চঞ্চল লোকও বুদ্ধিমান হয়, এই শ্রীমান্ তার একটী নমুনা। এসবও তার চরিত্রে ধর্ত্তব্য নয়। তার চরিত্রের আকর্ষণীয় দিকটা অন্যত্র। এমন সহানুভূতি ও দরদসম্পন্ন হৃদয় সচরাচর দেখা যায় না। তাই এই জাতীয় লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিচিতকে আপন করিয়া নেয়।

করাচীর মুসলমান, বাংলায় কি কাজে আসিয়াছিল, তা জানে সে আর পুলিশের লোকে। আমরা শুধু জানি সেটা ত্রিশ সাল, একটা 'ওলটপালট এস্‌পার কি ওস্‌পার'-গোছের লগ্ন সেটা ভারত-বর্ষের। আর বাংলার তো কথাই নাই—তার ভাগ্যাকাশে সেদিন সমস্ত কয়টা গ্রহই পূরারকমে কুপিত হইয়াছিল। এ হেন দিনে করাচীর মুসলমান বাংলাতে! কেনরে বাপু, গণ্ডগোল করিতে টিকিট খরচ করিয়া এতদূরে আসা কেন! মরার মত জায়গার কি ও-বালির দেশে এতই অভাব! কথা শুনিয়া শ্রীমান্ 'মৃদু মৃদু হাস্য' করিত। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বাংলাটা বুখারী বলিতে পারিত না, কিন্তু বুঝিতে কিছু কিছু পারিত।

কলিকাতাতে পুলিশের লোক বুখারীকে সেই-খোঁজা খুঁজিয়াছে, হারাইলে গৃহস্থেরা ঝোপজঙ্গল আদাড়পাঁদাড় যেমন করিয়া খোঁজে।

একটী বড় রাস্তার উপরে এই মুসলমানটী থাকিতেছে, পুলিশ খবর পাইয়া ফেলিল। পুলিশ আসিয়াছে, বাড়ী বেষ্টন করিয়াছে, বিশ্রামকারীদের মধ্যে এ সম্বাদ প্রচার হইয়া গেল।

বুখারী অতি আস্তে একটী দরজা খুলিয়া বাহির হইল। পাতলা রোগা মানুষ, ধারণা ছিল যে, পুলিশের দৃষ্টির উপর দিয়া পিছলাইয়া যাইবে এবং সরিয়া পড়িবে। রাহুর দৃষ্টি এড়ানো যায়, শনির দৃষ্টি এড়ানো যায়—এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে বাধ্য আছি। পীড়াপীড়ি করিলে, চাপিয়া ধরিলে এও বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত থাকিব যে, মৃত্যুকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি! শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা করে না কি—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?"

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ওস্তাদজী (দক্ষিণ কলিকাতার অমর চাটার্জ্জী) ছিলেন, তিনি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়াছিলেন—"ব্যাটা করাচীর মুসলমান, একি তোমার দেশের পুলিশ পেয়েছ যে, ইচ্ছা হোল আর দেশ ছেড়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলে ? নে ব্যাটা বল্, তারপর কি হোল।"

তারপর হইল পুলিশ-দর্শন। দরজা খুলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতেই দেখিল যে, এ পোড়া মুল্লুকে রাতদুপুরেও অন্ধকার নাই। আলোগুলি সমান উৎসাহে সানন্দে জ্বলিতেছে। মাথার উপর পাগড়ী আর পায়ের তলায় ছায়া লইয়া পুলিশ এদিক ওদিক ও সর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া আছে। শেষে কি এই পদছায়ায় শরণ নিতে হইবে !

গ্রীষ্মকাল, একপাল কুলি ও ভিখিরী কাছেই ফুটপাতের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। দেখিয়া বুখারীর নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা

হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে—"এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিৎ।" বুখারী ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেল।

এর পরের ইতিহাস অতি সহজেই অনুমেয়। মাথার উপরে লাল পাগড়ী, আর মগজের মধ্যে কালো সন্দেহ—এই তো পুলিশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পুলিশের দৃষ্টিতে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি অনাবশ্যক আপদ-বালাই নাই। সে দৃষ্টি একেবারে মার্জ্জিত, মুক্ত ও নিরাসক্ত ;—সমস্ত পৃথিবীটাই সে দৃষ্টির নিকট একটা বড় রকম শয়তানের আড্ডা, আর মানুষগুলি সেই আড্ডায় ছোট-বড় এক একটী চেলাচামুণ্ডা। সৃষ্টি ও সমাজ সম্বন্ধে এতবড় একটা দার্শনিক দৃষ্টি পুলিশেরই সম্ভব।

সেই পুলিশ, সন্দেহ যার চোখে স্বর্গীয় জ্যোতি জ্বালাইয়াছে—বুখারী চাহিয়াছিল তাদের নাকের ডগাতেই আত্মগোপন করিতে। সে তখনও জানিত না যে, পুলিশ এমনই একটী প্রদীপ যার নীচে অন্ধকার থাকে না। কবি তো খামাকা বলেন নাই যে, "তোমার আলোয় নাই তো ছায়া।"

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই"—বলিয়া পুলিশ দেখিতে লাগিয়া গেল।

সে এক ডাকাতপড়া হৈ হৈ ব্যাপার আর কি! কুলি ও ভিক্ষুকের দল যেন জাগিয়াও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—চোখে মুখে এমনি ভূতে-পাওয়া দৃষ্টি। কিন্তু ভূতও পালায় গুঁতার চোটে। এখানে একটা শুভ-সম্বাদ দেই, যাতে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকই আশ্বস্ত হইবেন। আমাদের দেশবাসীর প্লীহাগুলি আর আগের মত নরম নাই—অনেক মজবুত টেকসই হইয়াছে। সেদিন তাই বুটের ফুটবল-

কিকগুলি পেটের উপর অমন অনায়াসে তারা পাতিয়া লইতে পারিয়াছিল।

বুখারীর প্লীহাও এই পরীক্ষায় পড়িয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। সে কথা থাক্। ছাই উড়াইয়া দেখিতে গিয়া রত্ন মিলিয়া গেল। ফলে, 'রাধিকার মানে পুলিশের হৃদয়ে উল্লাস'—বঁধুয়া মিলালো রাস্তায়।

এইখানটায় ওস্তাদজী বুখারীকে বলিয়াছিলেন—"কেমন, দেখ্‌লি তো ব্যাটা, এ তোদের সিন্ধী পুলিশ নয়, খোদ টেগার্ট-সাহেবের পুলিশ। নে বলে যা, তারপর কি হোল। ব্যাটা হারামজাদা, আচ্ছা বুদ্ধি করেছিলে বাবা, একেবারে কুলির মধ্যে ডুব!" এবং শেষে সান্ত্বনার সুরে কহিয়াছিলেন—"নে, দুঃখ করিস্‌নে। শেষটাতো সেই ভদ্রলোকের দলেই এলি।" বলিয়া আমরা যত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলাম, তাদের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঝাঁটার মত মার্জ্জনা করিয়া নিলেন।

পরের দিন পুলিশের এক বড় সাহেবের নিকট বুখারীকে হাজির করা হইল।

সাহেব চোখের কোণে দেখিয়া লইয়া কহিল—"এই সেই করাচীর পাখী! শেষটা তবে ধরা পড়লে?"

ওস্তাদজী কহিলেন—"তুই কি বল্লি? বল্লিনে কেন, প্রিয়তম, ভীরু পাখী পিঞ্জরে এসেছি; দোহাই তোমার, দ্বার কোরনা রুদ্ধ কোরনা।"

কথাটা ইংরেজী করিয়া বুঝাইয়া দিতে বুখারীও আমাদের মতই হাসিয়া উঠিল। পরে কহিল—"আহা, যদি জান্‌তাম।"

সাহেব জানিতে চাহিল—বুখারীকে কোন্ শয়তানে প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সে করাচী ছাড়িয়া এই বাংলাতে আসিয়া ঢুকিয়াছে। বুখারী বিনীতভাবে কহিয়াছিল যে, হুজুরকে যদি শয়তানে সাতটি সমুদ্র এবং তেরটী নদী পার করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিতে পারে, তবে দেশেরই একস্থান হইতে অন্যত্র তাকে সরাইয়া আনিতে পারা কি বেশী আশ্চর্য্যের বিষয়!

শুনিয়া সাহেব খুসী হইল, এবং ঘোঁৎ করিয়া একটা আওয়াজ ছাড়িল; বলিল যে,—বাংলায় যখন আসিয়াছে, বেশ, তখন তার পূরা মজাটা ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

এবার বুখারীর খুসী হইবার পালা। স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া সে যাহা কহিয়াছিল, তাহার কবিতায় তর্জ্জমা এই—'অতো করুণা তোমার হৃদয়ে রহিবে গাঁথা।'

কয়েক মাস বক্সা দুর্গে কাটাইয়া অবশেষে তার মজা ভোগটা শেষ হয়। বাংলার পুলিশ তাকে বাংলার সীমানার বাহিরে রাখিয়া আপদ বিদায় করিয়া আসে। এবং বিদায় অভিনন্দনে শাসাইয়া দেয় যে, এ পাড়ায় ফের যদি সে পা দেয়, ও-ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া তবে ছাড়িবে। বুখারী আশ্বস্ত হইয়াই ফিরিয়া গেল।

সাড়ে ছয় বৎসর আগের ব্যাপার, তবু ছবিটী পরিষ্কারই চোখের উপর আসে।

সেই সন্ধ্যায় নীচে পাঁচ-নম্বর ব্যারাকে 'খাণ্ডারবাহীর' আসর বসিয়াছে। গানের যন্ত্রপাতি সমুদা[illegible]

চাটার্জ্জী তবলার সামনে ঝাঁকিয়া বসিয়া এবং নেড়ামাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া লইয়া বিড়ি ফুকিয়া চলিয়াছেন। তাকিয়া ঠেস দিয়া 'খাণ্ডারবাণী' আসরের ওস্তাদ লক্ষ্ণৌপোষাক-পরিহিত হইয়া নলিনীন্দ্র সেন বিরাজ করিতেছেন, অতি আমীরী ঢংএ আলবোলার নল মুখে টানিয়া লইয়া তিনি ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন, সুর্ম্মাটানা-চোখ আবেশে স্তিমিত হইয়া আছে। দেখিলে সম্ভ্রম উদয় হয়—মন এক ছুটে অতীতের সেই নবাব বাদশার সঙ্গীত-মজলিশে গিয়া প্রবেশ করিতে চাহে। ওস্তাদের পাশে তার খাস মুন্সী (Private Secretary) ভূপতিদা' (মজুমদার) মাথায় লক্ষ্ণৌটুপি ও গায়ে জহরলালী-ফতুয়া পরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অদূরে 'খগরাজ পায় লাজ নাসিকা' লইয়া দীর্ঘকায় খাঁসাহেব (মিঃ রেজাক) হাঁটুর উপর পা তুলিয়া লইয়া মৃদু মৃদু শরীর দুলাইতেছেন, আর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন; হাতে চুণের বোঁটাটী এমনভাবে ধৃত—যেন ছেলেদের ইতিহাস বইতে সম্রাট্ সাজাহান হাতে গোলাপ ফুল লইয়া বসিয়া আছেন। উপরের ব্যারাক হইতে প্রায় সকলেই নীচে আসিয়া পড়িয়াছেন। সভার মধ্যে একধারে ক্ষীণকায় মধুদা' (সুরেন ঘোষ) ওষ্ঠে অস্ফুট হাসি নিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। তারই পাশে সুদর্শন প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী) চোখে শিশুদের কৌতূহল নিয়া একবার এটা আর একবার ওটার উপর চক্ষুকে ঘুরাইয়া নিয়া ফিরিতেছেন, আর মাঝে মাঝে সুরেনবাবুর সঙ্গে চুপে চুপে বাক্য-বিনিময় করিতেছেন। সভার মাঝখানে বিপুলদেহ মাষ্টার মহাশয় (যতীশ ঘোষ) কাঁচাপাকা মাথা নিয়া বেশ আসক্ত হইয়া বসিয়াছেন, ভাবখানা এই যে—কিছুই আজ

ফস্‌কাইতে পারিবে না, সতরঞ্চি উঠান ইস্তক দেখিয়া তবে ঘরে ফিরিবেন। তারই প্রায় কাছে ততোধিক বিপুল দেহ লইয়া রবিবাবু (সেন) প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁর ভাবখানা এই যে—ইহারা এখনও কেন আরম্ভ করিতেছে না, আর দুমিনিট ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিব, তারপর সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইব।

সবাই প্রায় আসিয়া গিয়াছেন, এখন আরম্ভ করিলেই হয়।

অবলাদা' (কর) অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ও মহেন্দর, (গায়ক ব্যানার্জ্জী) আর দেরী কর ক্যান্?"

মহেন্দর উত্তর দিবার আগে এক কোণা হইতে শোনা গেল কে বলিতেছেন—"বিলম্বের আর দেরী কত?"

সেই কোণা হইতেই উত্তর আসিল—"ব্যস্ত হন ক্যান্? আরম্ভ করলেই সুরু হবে।"

এমন সময় রঙ্গীন-পোষাক-পরিহিতা, অলঙ্কার-ভূষিতা, জরীর নাগরা পায়, ওড়না গায় রূপসী বাইজী আসরে আসিলেন। সঙ্গীত-সম্প্রদায় সবাই উঠিয়া আসিয়া আ-ভূ কুর্ণিশ করিয়া দুইহাত বারম্বার কপালে ঠেকিয়া বাইজীকে অভ্যর্থনা করিল। বাইজী পায়ের ঘুঙ্গুর বাজাইয়া আসরের মধ্যখানে আসন গ্রহণ করিলেন।

ওস্তাদজী আলবোলার নল ফেলিয়া অর্দ্ধোত্থিতভাবে দুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন—"আইয়ে বিবিসাব।"

সভার মধ্যে একটা আন্দোলন বহিয়া গেল। দেব-সভায় উর্ব্বশী যেন নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলেই নিজেদের এক একটা দেবতার ন্যায় বোধ করিতে লাগিলাম।

আনন্দের অমৃত যেন কলস উপুড় করিয়া পান করিয়া লইয়াছি, এবম্প্রকার নেশা ও উত্তেজনা আমাদের প্রত্যেককেই আসিয়া আক্রমণ করিল।

বুখারীকে বাইজী পোষাকে মানাইয়াছিল—স্বীকার করিতে হইল। গানের ফাঁকে ফাঁকে বাইজী উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন কয়েক পাক নাচিত—তখন আমাদের হৃদয়গুলি ঢেউ-খাওয়া নদীর মত আথালিপাথালি করিতে ভুলিত না। সবচেয়ে বিষম হইত যখন বাইজী বিশেষ বিশেষ পাত্র বাছিয়া অপাঙ্গ হইতে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করিত।

আমিও কয়েকবার তার আঁখির প্রসাদ পাইলাম। তাতে অনেকে ঈর্ষ্যায় কাতর ও বিষে নীল হইল, তাদের দৃষ্টি ভীমরুলের হুলের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমি নিজের সৌভাগ্যে গর্ব্বিতবোধ করিলাম এবং এদিকে আমার কর্ণমূলও ঘন ঘন আরক্ত হইতে কোন ত্রুটি করিল না। বাইজীর সে-দৃষ্টি আজও মনে আছে। লিখিতে সাধ যায়—"সেই দৃষ্টিখানি, কেমন করিয়া বলিব সেই দৃষ্টিখানি।" সন্ন্যাসীর তৃতীয় নয়ন দগ্ধ করিতেই শিখিয়াছিল, এ-রকম বিঁধিতে শেখে নাই। ভস্ম-হওয়া মদন আর বাণ-বিদ্ধ হরিণ, মানে এই যেমন আমরা—এর মধ্যে কার অবস্থা বেশী কাহিল ভাবিতেছি।

এদিকে দেব-সভায় আবার আনন্দধ্বনি ও হাসি উঠিল, বাইজী বোধ হয় হাসির শান-দেওয়া মৃদু সঙ্কেতময় দৃষ্টি কোন ভাগ্যবানের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

কাতর হইয়া কে কহিলেন—"সখি, অমন তেরছ নয়নে চেওনা।"

অমর চাটার্জী তবলার উপর হাত চালাইতে চালাইতেই বাইজীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া কহিলেন—"ও হারামজাদা, তোমার এতও আসে।"

কে একজন সংশোধন করিল—"হারামজাদা নয়, হারামজাদী।"

বাইজী হারামজাদী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ও জিভ বাহির করিয়া ভেংচি কাটিল। সুন্দরীর ভেংচি—দেখিয়া আমরা কেহই হাস্য-সংবরণ করিলাম না।

সে-দিন হইতে সাড়ে ছয় বছর সরিয়া আসিয়াছি, রোজই আরও দূরে সরিয়া যাইতেছি। কিন্তু বক্সাদুর্গের বন্দী-দিবসের এই সুখ-স্মৃতি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারিতেছি না—তাহা ছায়ার মতই মনের নিত্য-অনুগামী হইয়া চলিয়াছে।

দূর করাচী হইতে লোকটী বাংলায় আসিয়া ধরা পড়িল, আমাদের সঙ্গে কিছুকাল সুখ-দুঃখে কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় যে সে এ-দেশে এতগুলি মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি রাখিয়া গেল—তা বোধ হয় সে-ও জানিতে পারে নাই।

আজ জেলের গরাদ-দেওয়া জানালা দিয়া রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, কাকে যেন ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—"কত অজানারে জানাইলে তুমি।"—

ডাক্তার গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে এ-গল্পটি প্রচলিত।

ডাক্তারকেও প্রথম দেখি বক্সা কেল্লাতে তার বিশেষত্ব তার কদমফুলী কেশ—মাথার উপর যেন সজারু-ক্ষেত বোনা হইয়াছে।

তাকে চিরুণী চালাইতে দেখিয়া কে নাকি গাহিয়াছিল—"কেন পাস্থ, এ চঞ্চলতা।" ডাক্তারও হাসিয়া কহিয়াছিল—"ঠিক কইছরে ভাই, এ চিরুণী ফিরুণীর কম্ম নয়, রীতিমত মই দেয়া দরকার।" ডাক্তারের দ্বিতীয় বিশেষত্ব তার মুখের একটি টানিয়া টানিয়া-বলা বুলি—যেটী কোন ঘটনাস্থলে প্রবেশের মুখে সে ব্যবহার করিত—"কাজ্যভা কিরে মশায়।" ডাক্তারের সর্ব্বত্র—"ইয়েস-এ্যাডমিশন"। সকলের সঙ্গে মিশিবার সহজ শক্তি তার। এটা অর্জ্জিত গুণ নয়, নিয়াই জন্মিয়াছে। ভাগ্য বলবান—তাই শত্রু জয় করিবার হাঙ্গামা তার নাই, কারণ তার শত্রু নাই বলিলেই হয়।

এই গুরুগোবিন্দ ডাক্তার যখন টের পাইল যে, পুলিশে বাড়ী বেষ্টন করিয়াছে, তখন 'শ্রীউষা—ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।' গুরুগোবিন্দ বাসা ছাড়িবার মতলব করিল।

এ কলিকাতার বাড়ী নয় যে, নিজের ব্যূহেই অভিমন্যু হইতে হইবে। এর সব দিক দিয়াই নির্গমন চলিতে পারে। পলায়নে পায়খানার পথও প্রশস্ত, আপদ্ধর্ম্মে লিখিত আছে। বাহির হইতেই শ্রীউষার আলোতে দেখা গেল তত্রস্থানেও এক পুলিশ,ব্যূহের নির্গমন-পথ আটকাইয়া দণ্ডায়মান। কানামাছি-ভোঁ করিয়া ডাক্তার দৌড় দিল।

সিপাহী প্রস্তুত ছিল না, ব্যাপারটা মালুম হইল একটু দেরীতে। তখন কাঁধের উপর চার-হাতি বাঁশের লাঠি তুলিয়া লইল। তারপর "শালা ডাকু" বলিয়া মারণ-মন্ত্র হাঁকিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিল। অগ্রে ধাইতেছে 'শালা ডাকু' ডাক্তার গোবিন্দ—পশ্চাতে ধাইতেছে বংশ কাঁধে ধ্বংস সিং। ছবিখানা মনে মনে দেখিয়া লইয়া স্মরপতি চক্রবর্ত্তী

নাকি বলিয়াছিল—"এ যে দেখছি, আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি।"

বেশীদূর যাইতে হইল না। সামনেই পাটের ক্ষেত। প্রবেশ-মুখ বুকসমান উচু বাঁশ দিয়া বন্ধ। গতি রুদ্ধ হইল। ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পাটের ঘন অরণ্যে অজ্ঞাতবাস করিবার সাধ হইল; কিন্তু আগে দেখিয়া নেওয়া দরকার পুলিশটা কতদূর রহিয়াছে। ব্যাটা যা দৌড়াইতে পারে—যেন রেসের ঘোড়া। ঘাড় ফিরাইতেই গুরুগোবিন্দ মজুমদার দেখিল যে, ধ্বংস সিংহ সিংহ-বিক্রমে মাথা তাক্ করিয়া লাঠি উঠাইয়াছে। মুখে তার মন্ত্র হাঁকিত হইতেছে—"শালা, ভাগ্‌তা হ্যায়।"

লাঠি মাথায় পড়িল বলিয়া। সত্যই মাথায় লাঠি মারিবে নাকি। ব্যাটাদের বিশ্বাস নাই। মাথা বাঁচানো আশু কর্তব্য হইল—পাটক্ষেতে প্রবেশের কথা পরে ভাবিলেও চলিবে। অতএব ডাক্তার গুরুগোবিন্দ রুখিয়া দাঁড়াইল, দাঁত-মুখে খিঁচুনী দিয়া কহিল—"হাম কি ডাকু হ্যায় না চোর হ্যায় যে তুমি লাঠি উঠাতা হ্যায়।"

লাঠি নামাইয়া লইয়া পুলিশটী কহিল—"বাবু, তবে এমনভাবে দৌড় দিলে কেন?"

—"তোমার বুদ্ধিভিতো বহুৎ দেখছি। দৌড় দিলেই যদি চোর আর ডাকু হোতা হ্যায়, তবে খেলার মাঠমে দলে দলে চোর ডাকু দৌড়াতা হ্যায়, লাঠি লেকর ওধার যাওনা কেন বাপু!"

পুলিশ নাছোড়বান্দা, হটিতে চাহে না। কহিল—রাস্তাটা খেলার মাঠ নহে,আর বাবু যে খেলিতে বাহির হইয়াছেন, তেমন তো বোধ হইল না।

গুরুগোবিন্দ সুর ঢিলা করিয়া লইয়া করুণ পর্দ্দায় আনিল। কহিল—"দেখ সিপাইজী, পায়খানাকোবাস্তে দৌড় দিয়া।"

সিপাইজী কি দেখিল সেই জানে, কিন্তু চোখদুটা তার কপালে ঠেলিয়া তুলিল। পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিল—নিজের বাড়ীর পায়খানা ছাড়িয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া হয়রাণ হইবার আবশ্যকতা কি ছিল, খামাকা কষ্ট পাওয়া হইল।

—"বহুত বেগ হুয়া থা, তাই একটু ভুল হো গিয়া। চল্ বাবা, ফিরেই যাই। এ নিয়ে আর ডিবেট করে লাভ নেই।"

—"চলিয়ে বাবু।"

যে-রাস্তা দিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই রাস্তায় ডাক্তার ফিরিয়া চলিল।

ডাক্তার গোবিন্দ সেই হইতে ক্ষেতের মুখে বাঁশের বেড়া দেওয়ার ভয়ানক বিরুদ্ধে। ছাগল-গরু আটকাইবার ছলে কৃষক ব্যাটারা বেশ ফন্দী করিয়াছে, মানুষকে পর্য্যন্ত আটকাইয়া দিল। পশু-পর্য্যায়ে পড়িয়া গিয়া ডাক্তার গোবিন্দ অবরুদ্ধ পশুর মতই আক্রোশে ভিতরে ভিতরে সেদিন গুমরাইয়াছিল।

ডাক্তার বলে—"হয় বাঁশ দিয়া ক্ষেতের বেড়া দেও, নয় পুলিশের লাঠি কর। দুটোর একটা কর—নইলে যে দেশে টেকা দায়। বাঁশ দিয়া সমুখ পিছন দুদিকেই আক্রমণ—কাঁহাতক সহ্য করা যায়।" আইন-সভার দৃষ্টি যাতে এ দিকে আকৃষ্ট হয়—খালাস পাইলে সে চেষ্টা করাই ডাক্তার গোবিন্দের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, আমাদের সে তা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিল। স্বদেশী-ফদেশীর কথা পরে হইবে।

ডাক্তারকে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা তা হোলে সত্য !"

কিছুক্ষণ দৃষ্টি দিয়া বক্তাকে বিদ্ধ করিয়া পরে ডাক্তার গম্ভীর গলায় চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল—"কেন, বাঁশ বিশ্বেস করেন না বুঝি ? খুব নাস্তিক হোয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। বাঁশ না গেলে আপনাদের বিশ্বাস হবে না"—বলিয়া ডাক্তার উপস্থিত সকলের উপর চোক ঘুরাইয়া লইয়া দম ছাড়িল, এবং শান্ত ও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল।

আর একজনের ধরা-পড়ার কথা বলি।

এ গল্পের যিনি নায়ক, নামে বা চেহারায় কোনটাতেই তিনি আমার পরিচিত নন্। যেমন শুনিয়াছি, তেমনই লিখিলাম। গল্প সত্য কি মিথ্যা, তা আমি জানিনা। শুধু জানি—এই জাতীয় গল্প ক্যাম্পে এত চল্তি ছিল যে, তা সত্যের মতই সম্মান পাইয়াছে। মিথ্যা হইলেও এরা আমাদের বন্দি-জীবনে যে রস যোগাইয়াছে, তা সত্য ঘটনাতেও সরবরাহ করিতে পারে নাই। যা ঘটে, তাই শুধু সত্য নয়। মানুষের কল্পনায় ও কামনায় যাহা ঘটিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, অথচ ঘটে না, তাহাও কম সত্য নহে। হয়তো জীবনের অন্তর-ইতিহাসের দিক দিয়া তাহারাই বেশী মূল্যবান ও সত্য। মোট কথা, যে-গল্পটী এখন বলিব, তাহা সত্য কি মিথ্যা, সে ভাবনা আমার নয়। আমি আর দশজনের মত ইহা শুনিয়াছি, আরাম উপভোগ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘদিনেও তাহা ভুলি নাই। ক্যাচ

জেলের সত্য অত্যাচারগুলি এতদিনে বেশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া তাদের মনে করিতে হয়।

ভদ্রলোকটি কলিকাতাতেই ধৃত হন। তাঁকে আই-বি অফিসের এক বড় কর্ম্মচারীর সম্মুখে হাজির করা হয়। সঙ্গে ছিল এক পুলিশ ইনস্পেক্টর যিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। অফিসার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"বসুন।"

ভদ্রলোক বসিলেন।

অফিসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম?"

ভদ্রলোক সবে মাত্র বসিয়াছিলেন, প্রশ্নটা শুনিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পার্শ্ববর্ত্তী ইনস্পেক্টরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কেমন দেখলেন তো? কতবার আপনাকে বল্লুম, মশায় আমি সে লোক নয়। তবু নিয়ে এলেন?"

তারপর অফিসারকে,বলিলেন—"স্যার, তখনই ওঁকে বলেছিলুম। জিজ্ঞেস করে দেখুন, বলেছিলুম কিনা। উনিও আমার নাম জানেন না, আর আপনিও জানেন না। অথচ আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, কোথাও একটা মস্ত ভুল হয়েছে, আমাকে নিয়ে মিছিমিছি এ টানাটানি। কতবার বল্লাম, আমি সে-লোক নয়, তবু—না, যেতে হবে আপনাকে।"

ভদ্রলোক ঘুরিয়া আবার ইনস্পেক্টরকে বলিতে লাগিলেন—"আপনার ধারণা, পুলিশের ভুল হতে পারে না, আর আমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা সত্য কথা বলিনা।" পুনরায় অফিসারের দিকে আবর্ত্তন—"স্যার, আমাকে তবে পাঠিয়ে দিন, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

অফিসার বলিলেন—"দিচ্ছি, বসুন।" ইনস্পেক্টরকে কহিলেন, 'দেখুন তো গাড়ী আছে কিনা!"

গাড়ী আছে কিনা দেখিতে ইনস্পেক্টর বাহির হইয়া গেলেন। অফিসার আপন কাজে মগ্ন হইলেন। ভদ্রলোকটাকে 'বসুন' এবং 'আপনার নাম কি', এ দুটী কথা ছাড়া এতক্ষণ কথা বলিবার অবকাশ অফিসার বা তাঁহার ইনস্পেক্টর কেহই পান নাই। ভদ্রলোককে সামনে বসাইয়া রাখিয়াই তিনি নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটী অফিসারকে কহিলেন—"স্যার, যা ভয় পেয়েছিলুম! বুঝতেই পারেন, একে দিনকাল মোটেই ভালোনা, তার উপর পুলিশের হাঙ্গামা, কত বড় শক্ত নার্ভের দরকার,—তা স্যার আপনাকে আর কি বুঝাব।" বলিয়া হয়তো আরও কিছু বুঝাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় ইনস্পেক্টর ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে গাড়ী আছে।

অফিসার কহিলেন—"একে তবে পৌছে দেবার বন্দোবস্ত করুন। আর সেলে যে-দুজন আছে, তাদেরও নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনি তবে আসুন!"

"নমস্কার"—বলিয়া সানন্দে ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইনস্পেক্টরের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই গাড়ী তাঁকে ও সেলে যে-দুজন আছে তাদের নিয়া আসিয়া থামিল প্রেসিডেন্সিজেল-গেটের সামনে। ভদ্রলোক ঝাঁকের কইয়ের মত ঝাঁকে মিশিয়া গেলেন।

তাঁকে একজন বলিয়াছিল—"ফাঁকি দিতে পারলেন না তবে!"

ভেটিনিউ—

—"কোথায় শুনেছেন থিয়েটারে পুলিশ ভোলে? শাস্ত্রেই আছে, পাষাণে কাঁদা নাই। পুলিশকে চিন্‌তে আপনাদের ঢের বাকী আছে। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে চেনা যায়, কিন্তু মর্ত্ত্যের এই সগুণ জীবটীর সীমা শেষ করা—সে নৈব নৈবচ।"

জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে যে কত রকম অভিনয় চলিতেছে, তা ভুলিয়া থাকি। এই রকম দুই একটী লোকের কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে চেতনা সে-দিকে আকৃষ্ট হয়। তখন চোখের উপর হইতে পর্দ্দা সরিয়া যায়, দেখিতে পাই যে বিরাট নাট্যশালায় আমরা সবাই অভিনেতা। কিন্তু নাট্যকারটী কে—তাহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমি ও আমার মত যারা নিরীহ, শুধু তাদেরই জেলখানায় প্রবেশ বিশেষত্বহীন। এই বিশেষত্বহীনদের বাদ দিলে যা থাকে, তাও সংখ্যায় নেহাৎ কম হইবে না। এরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর কীর্ত্তিমান। এদের জীবন আর দশজন বাঙ্গালীর মত ঢিমা-তালে বহে না, ঘটনা হইতে ঘটনায়,—তা ছোটই হউক বা বড়ই হউক, লম্ফ দিয়া বিষম চালে চলে।

এদের জীবন দেখিতে ছোট হইলেও আসলে তাহা ইতিহাস জাতীয়। পৃথিবীতে ছোট নদীও আছে। জল থাকিতেও সরোবর-দীঘি-বিল তার আত্মীয় নয়, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের শোণিতই তার স্রোতে। ডোবা, পুকুর, দীঘি ইত্যাদির মত নিজ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া শান্ত স্বপ্নে দিন-যাপন এর রক্তে নাই। পাড়ার দুরন্ত ছেলেগুলি যখন স্নান করিতে সাঁতার কাটিতে নামে তখনই যা একটু অশান্তি বদ্ধ জলাশয়গুলিতে দেখা দেয়—ছোট ছোট ঢেউগুলি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তীর ছুঁইবার আগেই মিলাইয়া যায়। এ ব্যতীত সেখানকার শান্তিতে কোন বিঘ্ন কখনও দেখা দেয় না। আর নদীতে—হউক না কেন সে ছোট নদী, যখন উত্তরে পাহাড়ের মাথায়

বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, তখনই এই নদীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তারপর পাহাড়ের জলকে সমুদ্রে বহিয়া নিবার জন্য দিনরাত্র কী তার উন্মত্ততা ও প্রচণ্ডতা। তীর প্লাবিত করিয়া জলকে দিকে দিকে পাঠাইয়া দেয়—খাল-বিল-মাঠ ভরাইয়া ফেলে, এবং ফেনা ও ঘূর্ণাবর্ত্ত লইয়া যুদ্ধের ঘোড়ার মত সে ছুটিয়া চলে। গ্রামের বৌ-ঝিরা স্নান সারিতে ও জল ভরিতে আসিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া নদীটিকে দেখিয়া লয়, ভাবে—তাদের সেই পরিচিত শান্ত ছোট নদীটি এমন হইল কেন! কোথায় সুদূরে এর রক্তের যোগ রহিয়াছে —তাই আজ আর একে আপন ও আত্মীয় বলিয়া ধরা যাইতেছে না। নিশ্চয় রক্তে এর কোন অভিশাপ আছে, তাই এমন ক্ষিপ্ত ও ভয়াবহ আকার এর হইতে পারিয়াছে। তারপর স্নান সারিয়া ঘট ভরিয়া স্রোতের জল লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু কলসের মধ্যে যে-স্রোতটুকু ভরিয়া লইয়া যায়, তাও শান্ত থাকিতে চায় না, প্রতি পায়ে উছলাইয়া পড়িতে থাকে, সুযোগ পাইলেই ঘরের মেঝেতে গড়াইয়া ছোট ছোট ধারায় আঁকাবাঁকা শিশু-স্বপ্নগুলিকে স্রোতে ভাসায়। নদী ছোট বটে, কিন্তু সে যে মহানদীগুলিরই স্তন্যপুষ্ট সন্তান—তা ভুলিতে দেয় না। নদী সে—সে পুকুর-দীঘির আত্মীয় নয়।

এই সাত বছরে আমরা ধরা পড়িয়াছি তিন হাজারের মত। দরিদ্র বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমরা। অভাব-অনটনের মধ্যেই আমদের জন্ম—মৃত্যু পর্য্যন্ত সে-দারিদ্র্য আমাদের ছায়ার মতই নিত্যসহচর। স্বাস্থ্যে আমরা ভারতের অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় বড় ক্ষীণ-সম্বল। সীমান্তের পাঠান, মরুভূমির রাজপুত, পাঞ্জাবের

শিখ—এদের পাশে দাঁড়াইতে আমরা সঙ্কোচ ও লজ্জাবোধ করি। মনে হয়, এই সংঘর্ষের পৃথিবীতে আমরা যেন বিধাতার পরিহাসের মতই আসিয়াছি। স্বাস্থ্য ও শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে-প্রাণ আগুনের মত জ্বলিতে থাকে, তার কোন রক্তাভাই তো আমাদের দেহে প্রতিফলিত হয় না। একটা পাঠান বাচ্চাকে দেখিলে মনে হয়, বন্য পশুর প্রাণ-শক্তি এর শরীরে আটকা পড়িয়া ছটফট করিতেছে, দেহের সীমায় আর বুঝি এ প্রবল প্রাণ-বন্যাকে ধরিয়া রাখা যাইবে না। কিন্তু আমাদের দিকে চাহিলে ও-রকম কোন কথা মনে হইবার হেতু থাকেনা—এই দুর্ব্বল রোগা শরীরের মধ্যে কোথায় প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তা যন্ত্র দিয়া আবিষ্কার করিতে হয়।

অথচ এই বাঙ্গালী নিজেকে আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী বলিয়া জানে, অন্যান্য প্রদেশও তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া নেয়। এর কারণ কি হইতে পারে, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কিসের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহা আজ বুঝিতে পারিয়াছি। অন্য প্রদেশের সন্তানরা প্রাণ নিয়াই জন্ম লয়, যেমন প্রাণ-জগতের অন্যত্রও দেখা যায়। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পশুকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে এরা পারে। কিন্তু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এদের বারো-আনারও উপরের অংশ নাবালক থাকিয়া যায়। প্রাণের পাথেয় জীবন-পথে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষের অর্থ তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। নূতন তীর্থে বা বন্দরে পৌছিবার জন্য প্রাণ শুধু রসদ মাত্র।

এইখানেই আমরা অপরাপর প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। তারা যেমন প্রাণ নিয়া জন্মগ্রহণ করে, আমরা তেমনি জন্ম লইবার সময় মন নিয়া আসি। মনের সম্বলেই আমরা এদের চেয়ে

ধনী ও অন্ত্যজাতের হইয়া পড়িয়াছি। প্রাণ দিয়া সৃষ্টিতে প্রাণী টিকিয়া থাকে, আর মন দিয়া মানুষ সৃষ্টির ঘোমটা খুলিয়া তার রহস্তের মুখোমুখী দাঁড়ায়। প্রাণ বাহন—মন সে-বাহনের সোয়ার। কোন দুর্গের দুয়ারে সে থামিবে এবং কোন বন্দিনীকে উদ্ধার করিয়া লইবে—মানুষের জীবন-নাট্যের এই তো সংক্ষিপ্ত অথচ ক্রমবর্দ্ধমান ইতিহাস। সৃষ্টিতে প্রাণের প্রয়োজন পরিত্যক্ত হইতে পারে কিনা—এই অসম্ভব স্বপ্ন নিয়াই মন আসিয়াছে, এবং প্রাণের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

এই জোরেই ভারতের রঙ্গমঞ্চে আমরা নায়কের সহজাত অধিকার লইয়া আসিয়াছি। আমরা ক্ষীণকায় বাঙ্গালী সত্য। আমরা নিরীহ, আমরা ভেতো—সবই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি করিব না। কিন্তু মরিয়া গেলেও, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'—এ-কথা মুখ দিয়া বাহির হইবে না। বাঙ্গালী মরুক,—কত জাতিই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া গেছে, কিন্তু সে যেন আত্মহত্যা না করে।

আমার এ-মনোবৃত্তির কারণ, আমি এই দীর্ঘদিন জেল-জীবনে যাদের দেখিয়াছি, যাদের সঙ্গে একত্র রহিয়াছি—তাহারা। তাহাদের সান্নিধ্যে যে-অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে—তাতেই আমার এ-গর্ব্ব দিনে দিনে পুষ্ট হইয়াছে।

আজ একেলা জেলের জানালায় লোহার গরাদের উপর পা দুটা তুলিয়া লইয়া চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছি। আষাঢ়ের আকাশ মেঘে-ঢাকা রহিয়াছে। নীচে পৃথিবীতে এ দুপুরেও ছায়া নামিয়াছে। বাহিরের আকাশের দিকে দৃষ্টি আমার বাহির হইয়া পড়িয়াছে,

যার আমি একাকী এখানে সঙ্কীর্ণ কোণে পড়িয়া রহিয়াছি। আমার মন আজ স্বপ্ন-লোকে প্রবেশ করিয়াছে। মেঘের আড়ালে দিনের সূর্য্যকে দেখা যায় না। আজিকার বাঙ্গালীর উপরে বর্ত্তমানের ও প্রাত্যহিকতার যে-ছায়া-আস্তরণ পড়িয়াছে, তার আড়ালে বাঙ্গালীকে আমি দেখিয়াছে। এ-দেখা আমার মিথ্যা নয় —হইতে পারে না। জানি না, জেল হইতে বাহির কোনদিন হইব কিনা। কিম্বা হইলে সে কবে এবং কি অবস্থায় বাহির হইব, তাও জানিনা। কিন্তু যে-সত্য আমি জানিয়াছি, তাহা এখানে লিখিয়া গেলাম। সত্যই আমি স্বপ্নে ডুবিয়া যাই নাই। আষাঢ়ের ছায়ান্ধকারে বসিয়া আমি নিজেকে প্রভুশাপে-অভিশপ্ত নির্ব্বাসিত মনে করিতেছি না। সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন-আলয়ের দিকে আমার মন নভোচারী মেঘের মত বাহির হয় নাই। আমি স্বপ্ন-সাধক নহি। আমার মন আজ ধ্যান-মুগ্ধ—দৃষ্টির উপর হইতে আজ কিছুক্ষণের জন্ম আবরণ সরিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস করিও সত্য বলিতেছি। দৃষ্টির আচ্ছাদন সরিয়া যায়—দৃষ্টি মুক্ত হয়। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন, অসীমের স্পর্শ তাতে লাগে, এবং সত্যকে দেখিয়া লওয়া যায়। জীবন আমার যেখানে যে-ভাবেই শেষ হউক না কেন, আমি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেলাম—মানুষের, সমাজের ও সভ্যতার নূতন অর্থ ও রূপ দিবার দুরূহ দায়িত্ব এই বাঙ্গালীর। মহান অধিকার নিয়া সে আসিয়াছে। আমার এ-কথা মিথ্যা হইবার নহে এবং মিথ্যা হইবে না। আমি সত্যকে দেখিয়াছি।

*   *   *   *

যত লোক ধরা পড়িয়াছে, তাদের সবার খবর জানি না, যাদেরও জানি তা-ও সব লেখা সম্ভব নহে। অনেক জিনিষ আছে যা স্বভাবতই গোপন। প্রকাশ্যে টানিয়া আনিলে তা কদর্য্য ও বিকৃত হয়। আমার বহুদিনের বিশ্বাস, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-স্নেহ-দয়া ইত্যাদি জিনিষগুলি এই জাতীয় বস্তু। ভাষায় এদের প্রকাশ দেওয়া রুচিবিগর্হিত। পূজারী যেমন সঙ্গোপনে পূজা করে এবং পূজার ভাবটি যেমন তার সারাদিনের কাজের উপর একটী পবিত্র ছায়া বিস্তার করে, হৃদয়ের প্রীতি-শ্রদ্ধাদিও নীরবে কার্য্যে ও ব্যবহারে তেমনি একটী অশরীরী আলোকপাত করিবে—তবে এর সত্য প্রকাশ হয়।

আর এক জাতীয় জিনিষ আছে—যা স্বভাবতঃ গোপন নয়, যা মন হইতে মনে দেহহীন পা ফেলিয়া যাতায়াত করার ক্ষমতা ও স্বভাব পায় নাই। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমনি একটী কঠিন সশস্ত্র নিষেধ ও শাসন রহিয়াছে, যার ফলে যা প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশ পাইতে পারে না। সমাজ যে এইভাবে কত সত্য-ভাষণের মুখে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া নিজের কতবড় ক্ষতি করিয়াছে, তা তার হুঁস নাই। তাই অকপট সত্য-ভাষণ হইতে সমাজ বঞ্চিত হইয়াছে। উজ্জ্বল, নির্ম্মল ও শক্তিমান ভাষায় নিজের ছবি ও স্বপ্ন সে দেখিতে পারিতেছেনা। তীক্ষ্ণ, নির্ম্মম ও কঠোর আঘাত দিয়া যে-কণ্ঠ সমাজের মধ্য হইতে ভীরু কলুষিত মিথ্যা-ভাষণ ও চিন্তাকে মার্জ্জিত করিয়া দিবে, নিজের সে-কণ্ঠ নিজ দোষেই সমাজ অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এর মধ্যেও সমাজের সৌভাগ্যের মত মাঝে মাঝে মানুষ আসে, যারা স্পর্দ্ধিত নয়—যারা তেজস্বী, যাদের ভয় নাই।

তাদের কণ্ঠে সত্য নিজ শব্দ অকস্মাৎ খুঁজিয়া পায়। কিন্তু সত্য যাকে বাছিয়া নিয়া আশ্রয় করে, তাকে এ-জন্য ভয়াবহ দাম দিতে হয়। ঈশ্বরের পুত্রকেও আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছি। সত্যকে পরীক্ষা করার অন্য কোন উপায় এখনও আমরা পাই নাই।

তাই যা জানি, তা সব বলা সম্ভব হয় না,—আর তা বলিবার শক্তিও অর্জ্জন করি নাই। যা সব চেয়ে প্রকাশযোগ্য ছিল, তা আড়ালেই থাকিয়া গেল। শক্তিমান সাধক যদি কেহ আসেন, এদের প্রকাশে পথ তিনিই দেখাইয়া আনিবেন। আমি আমার স্মৃতির হালকা পথ ধরিয়াই চলিলাম।

বক্সাতে গিয়া কিরণদাকে (মুখাৰ্জ্জী) পাই নাই, তিনি পরে আসেন। তাঁর চেনা-অচেনা সবাই তাঁর ভাইটী-শ্রেণীর ছিল। অবশ্য দু-একজন সম্মানজনক ব্যতিক্রমও ছিলেন। ভাইটীরা, বিশেষ করিয়া তার বয়স্ক ভাইটীরা, কিরণদা সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা যা-কিছু বলিবার ও রটাইবার সুযোগ পাইলে তা ছাড়িতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন—অর্থাৎ কিরণদা সবারই আক্রমণের পাত্র ছিলেন। পিতামহ-ভীষ্মের মত তিনি তাঁর শাসন ও আক্রমণের স্নেহ কুরু-পাণ্ডব সবাইকে সমানভাবে বণ্টন করিতেন। এ-বিষয়ে দল-বেদল—এ ভেদনীতি কিরণদার ছিল না। এ-রকমও দেখা যাইত যে, কিরণদা' তার বয়স্ক ভাইটীদের পর্য্যন্ত লাঠি নিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তাড়া করিয়াছেন। পলাতক ব্যক্তি অবশ্য তাঁর প্রাপ্তির সীমানার মধ্যেই থাকিতেন। ভাবখানা এই—গতিতে কিরণদাকে হটানো কি যে সে কম্ম। বাঁকা হাতের শাস্তি না পাইলে বুঝিতে হইবে কিরণদার স্নেহের চাপরাশ তখনও অপরাধীর ভাগ্যে জুটে নাই।

কিরণদা'কে আলোচনার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া যখনই বলা যাইত—"কিরণদা আপনি কি বলেন?" তিনি উত্তর করিতেন—"এ-বিষয়ে মতামত না দেওয়াই ভালো।"

'মতামত না দেওয়াই ভালো'—এ-কথাটা এক সময়ে বক্সাতে আমাদের মধ্যে খুব চলতি হইয়া গিয়াছিল এবং এই বাক্যটা যে কতবার কত সিরীয়স আবহাওয়ায় উচ্চারিত হইয়া আমাদিগকে সহজ ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করিয়াছে, তা ভাবিতে গিয়া আশ্চর্য্য হই।

কিরণদা'র কম্বলের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্যারাকের বারান্দায় কম্বল ইত্যাদি দিয়া তিনি একটা ঘরের মত করিয়া লইয়াছেন। দিবাভাগে এখানেই পড়াশুনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তিনি করিতেন—শুধু শয়ন-কার্য্যটার জন্য ভিতরে যাইতেন।

দেখিলাম, অনেকেই উপস্থিত আছেন, এবং দেখিয়া বুঝিলাম কিরণদা'কে ইহারা কাহিল করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, উহারা যে-পরিমাণে হাসিতেছে, নিজে জব্দ ও কাহিল হইয়াও কিরণদা' পরিমাণে তার চেয়ে কম হাসিতেছেন না। আনন্দে ইহারা তাঁহাকে হারাইয়া দিবে, এ যদি ইহারা কেহ ভাবিয়া থাকে, তবে সে ভুল ভালো করিয়াই ভাঙ্গিয়াছে।

'স্থান নাই, স্থান নাই'—কারণ, কিরণদা'র ছোট সে-তরী ভাইটারা কাণায় কাণায় ভরিয়া ফেলিয়াছে। স্থানাভাবে বেণুবাবু (রায়) কিরণদা'র ডেক চেয়ারের হাতলটাকে আসন বানাইয়া লইয়াছেন এবং সতীন রায়ের মত লোকও নিজের চেয়ারে যতীন দাশের জন্য উদ্বৃত্ত জায়গা তৈরী করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথি

ওষুধের বড় বাক্সটা ঠেলিয়া সরাইয়া টেবিলের উপর জায়গা করিয়া নিলাম। কিরণদা' সোৎসাহে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"এই যে।এক শূয়োর।"

এই জীবটার সঙ্গে আমার চেহারায় বা চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য মিল ছিল বলিয়াই যে এ-সম্ভাষণ, তা নয়। কিরণদা'র স্নেহের পরিভাষায় এটা অতি বনেদী সম্ভাষণ এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ অপ্রতিহত—ভাইটাদের বয়সের তারতম্য এক্ষেত্রে অবান্তর।

ঢুকিবার মুখেই শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আমাদের বীরেনদা'কেই (চাটার্জ্জী) তিনি কহিতেছেন—"ও শূয়োর, তুমিও -দলে আছ। না বাপু, এ-রকম ক্ষেত্রে কোন মতামত না দেওয়াই ভালো।"

সবাই মত আদায় করিবেই, কিরণদা'ও তাহা প্রদান করিবেন বীরেনদা কহিলেন—"ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা, আপনি শুধু এইটুকু বলুন।"

—"ও শূয়োর, তুমি কায়দা করে কথা বের করবে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।" বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ভাবখানা এই—এত কাঁচা লোক পাও নাই যে, সস্তাচালে মাৎ করিবে।

আমি কহিলাম—"কায়দা করে কথা বের করব না, সোজাই জিজ্ঞেস্ করছি।" কথা শেষ করিতে পারিলাম না। কিরণদা সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন—"দেখলে, কথা বলার কায়দা। লেখক মানুষ কিনা।"

"লেখক মানুষ"—এমনভাবে উচ্চারণ করিলেন যেন মস্ত একটা গোপন খবর প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং লোকের যদি লজ্জা থাকে,

তবে এর পরে তার থামিয়া যাওয়া উচিত। আমিও থামিয়া চুপ করিলাম।

কিন্তু বীরেনদা' নাছোড়বান্দা। কহিলেন—"তবে আপনি বলতে চান যে আপনি 'স্বাধীনতা' বিক্রী করেন নি?"

কিরণদা'র পক্ষ হইয়া যতীন দাশ কহিল—"না, কিরণদা' তেমন কথা বলেন না।"

—"মেয়ে দুটী 'স্বাধীনতা' কিনতে চাইলে কিরণদা' তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান নি?"

—"না, পিছন ফিরে দাঁড়ান নি, মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন",—যতীন দাশ উত্তর করিল। কিরণদা' মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে উভয়ের এই সওয়াল-জবাব শুনিতে লাগিলেন।

—"তিনি কি দুকাপি পত্রিকা টেবিলে ফেলে দেন নি?"

—"তারা দুকাপিই চেয়েছিল।"

উত্তর শুনিয়া কিরণদা' সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"যতীন বলে ভালো। বীরেন, তুমি ওর সঙ্গে পারবে না।"

বীরেনদা' কহিলেন—"মেয়ে দুটী বেরিয়ে গেলে পর তবে আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন, এ ঠিক কিনা বলুন।"

—"নিশ্চয় ঠিক। সত্য বলতে কিরণদা' পিছপা হন না।"

যতীন দাশের সমর্থন পক্ষে যাইতেছে না দেখিয়া কিরণদা' কহিলেন,—"শূয়োর, তুমি থাম। তোমার আর আমার পক্ষে ওকালতী করতে হবে না।"

আমি আবৃত্তি করিলাম—"কিরণদা', যতীন বলে ভালো।"—হাসির একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

বীরেনদা' কহিলেন—"কেন আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন ? আর ওদের ছে শেষটা আপনি 'স্বাধীনতা' বিক্রী করলেন ?"

কিরণদা' নিরুত্তর।

নয়নাঞ্জন-বাবু (দাশ) আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরণদা', রা পয়সা দিয়েছিল তো ?"

কিরণদা' কহিলেন—"কেন দেবে না ? তোদের মত লক্ষ্মীছাড়া ?" বাই হাততালি দিয়া সোৎসাহে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—"ও রণদা', আপনি যে ধরা পড়ে গেলেন।"

কিরণদাও হাসিলেন—"ও শূয়োরের দল, তোমাদের এ-মতলব ল।"

বীরেনদা' কহিলেন,—"আচ্ছা, মেয়েদের উপর আপনি এত চটা কন ? দেশে শুধু ছেলেই থাকবে—মেয়ে থাকবে না, এই বোধ হয় াপনি চান,—না ?"

—"না, কক্ষনো না—"

—"কি কক্ষণো না ?"

কিরণদা' উত্তর দিলেন না। একটী ছেলে কহিল,—"কিরণদা, মাহমুদ্গর-period আজ আর নাই, অবশ্য কোনকালেই ছিল া। বৌদ্ধমঠে পর্য্যন্ত ভিক্ষুনী, আশ্রমে পর্য্যন্ত তপস্বিনী। এবার সবাইকে নিয়ে দল করার পালা।"

—"শূয়োর, দাঁড়াও বার করছি তোমার পালা"—বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মোহমুদগরকে একটী আঘাত প্রদান করিলেন। উপস্থিত কলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

সতীন রায় কহিল—"দিন্‌তো, আরও কয়েকটা দিন্।

মোহমুদ্গর বুঝাতে এসেছে। দিন্ লাঠিটা আমার হাতে দিন্, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সতীন রায়ের হাতে লাঠি থাকা বেণুবাবু সমর্থন করেন না—তাই সতীন রায়ের উদ্যত বাহুকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন—"না লাঠি পাবে না! গাণ্ডীব এক অর্জ্জুনের হাতেই থাকে—কি বলেন কিরণদা' ?"

—"তুই ঠিক বলেছিস ভাইটী। এ-লাঠি কেউ পাবে না।" সতীন রায় কহিল—"লাঠি নয় পাবনা, তাই বলে তার খোঁচাও পাবনা ?"

"খুব পাবে"—বলিয়া লাঠিটা নিজ হাতে বেণুবাবু তুলিয়া সতীন রায়ের প্রার্থনা মিটাইলেন। খোঁচা খাইয়া সতীন রায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটা হৈ-হৈ ব্যাপার উপস্থিত হইল। বীররসের অভিনয়ের জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

—"যাও বেণু, তোমাকে মার্জ্জনা করে দিলাম"—বলিয়া সতীন রায় হাতের মুঠা হইতে ব্রাহ্মণ যেমন ফুল-দূর্ব্বা ছুড়িয়া মারে তেমনি ভঙ্গীতে মার্জ্জনাটাকে শূন্যে ছুড়িয়া দিল এবং বসিয়া পড়িল।

কিন্তু সতীন রায় বসিতেই যতীন দাশ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"উহু, গেছি গেছি"। সতীন রায় তার বিরাট নিতম্বদেশ একটু উত্তোলন করিলে যতীন দাশ সেই রোলারের তল হইতে নিজের শরীরটাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল—"ব্যাটা গুজরাটী হাতী।"

সতীন রায় যতীন দাশের আহত স্থানে যত্নের সহিত হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—"বাবা, একটু খাওয়া-দাওয়া আর একটু exercise ক'রো, বুঝলে ?"

এমন সময় ধীরেন-মাষ্টারের (নিয়োগী) গলা বাহিরে শোনা গেল। শৈলেন-দাস (অধিকাংশের রুণুদা') মহাশয় ধীরেন-মাষ্টারের নাম দিয়াছিল হিমেলষ্টস্। All Quiet-এর সৈনিকটির সঙ্গে ধীরেন-মাষ্টারের মিল রুণুবাবু আবিষ্কার করেন। সেই হইতে ধীরেন-মাষ্টার হিমেলষ্টসের "টস্" হইয়াই আখ্যাত হইত।

প্যারেড-ভলান্টিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে মেজর সত্য-গুপ্তের বিশ্বস্ত সহচর ছিল এই ধীরেন-মাষ্টার। লাঠি, ছোরা, কুস্তী ইত্যাদি বিষয়ে মাষ্টার শিক্ষা দিত ধরা-পড়ার আগে। মাষ্টার-নাম ব্যায়ামশালাতেই অর্জ্জিত।

দৃঢ় ও হৃষ্টপুষ্ট শরীর লইয়া ধীরেন-মাষ্টার প্রবেশ করিল।

বীরেনদা' মোটা গলায় হুকুম করিলেন—'Halt'.

ধীরেন-মাষ্টার সত্যই দাঁড়াইয়া পড়িল।

বীরেনদা' কহিলেন—'স্যালুউট—ডিস্‌মিস্'।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মিলিটারী কায়দায় স্যালুট সারিয়া মাষ্টার লেফ্‌ট-রাইট্-লেফ্‌ট পা ফেলিয়া আগাইয়া আসিয়া একটা জায়গা দখল করিল।

ধীরেন-মাষ্টার ধরিয়া বসিল, কহিল—"কিরণদা, বলুন না, টেগার্ট-সাহেবের কাছে কি-ওয়ারেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন। আপনারা জানেন তো?"

জানিতাম না। জানিবার জন্য উদগ্রীব হইলাম।

নয়ান-বাবু কহিলেন—"জিজ্ঞেস করুন, কি-রকম ওয়ারেন্ট টেগার্ট-সাহেব দেখিয়েছিলেন।"

আমরা কহিলাম—"বলুন না কিরণদা', ব্যাপারটা কি।"

ধীরেন-মাষ্টারের সঙ্গে আমরা সকলেই কিরণদা'কে চাপিয়া ধরিলাম এবং কিরণদা' বলিতে বাধ্য হইলেন।

কিরণদা' বলিতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু বলিবার সময় বিশেষ কিছু বলিলেন না। পুরাণো আমলের লোক, নিজেদের বিষয়ে গল্প করিতে তেমন অভ্যস্ত হন নাই। সে-কালের শিক্ষা—মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া। তাই অভ্যাসে এমন একটা সংযম কাজে ও ব্যবহারে এদের দেখা দিত, যা'র ফলে দরকার হইলেও দু'কথা তেমন করিয়া বলিতে পারেন না। মুখ বুজিয়া যে-জীবন আরম্ভ হয়, সে-জীবন তেমনি মুখ বুজিয়াই শেষ হয়; জীবনে যেন একটা গোপন নীরবতাকে বহন করিয়া লইয়া মৃত্যুর নীরবতার দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই এঁদের একমাত্র কাজ।

কত কর্মী যে এইভাবে নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে শেষ হইয়াছে, বাহিরের লোকে তার খোঁজ রাখেনা, জানেও না। হয়তো তা'দের কথা তা'দের বন্ধুরা-ই ভুলিয়া গিয়াছে, কিম্বা মনে করিতে হইলে জোর করিয়া মনে আনে। নিজেদের কোন দাবী-দাওয়া না রাখিয়া এ-ভাবে জীবন কাটাইয়া দিতে চরিত্রের যে-নিরাসক্তি ও দৃঢ়তার দরকার, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়। ইচ্ছা হইলেই এই জাতীয় সৈনিক হওয়া যায় না। আর, মানুষের যে-কোন বড় কাজের জন্য এই রকম মহৎ সৈনিকের প্রাণই ভিত্তি-মূলে উৎসর্গীকৃত থাকে। সমাজের ভিত্তিভার-বহনক্ষম প্রাণ খুব বেশী আসে না। যা'রাও আসে, তা'দের খবরও আমরা রাখি না; কারণ তা'দের চিনিবার জন্য যে-দৃষ্টি দরকার আমরা সাধারণ সম্প্রদায় সে-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত। আমরা শুধু দধিচীর অস্থি-দেওয়ার ইতিহাসই

জানি ; কারণ তা'তে বজ্র তৈয়ারী হইয়াছিল এবং সে-বজ্র দেবতাদের কাজে লাগিয়াছিল। কিন্তু মানুষের জন্য যে-অস্থি গোপনে বজ্রে রূপান্তরিত হইয়া যায়, দেবতাদের কথা দূরে থাক, মানুষ নিজেই তার খোঁজ রাখেনা ; বিপদে ও দুর্দ্দিনে তা'রই সাহায্যে যে জয়লাভ করে, তা'ও সে জানে না। শক্তি কে, কোথায় ও কেমন করিয়া সবার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গেল—এ অজানাই থাকিয়া যায়। আর, সৃষ্টির নিয়মও বোধ হয় এই—শক্তি ব্যয় হয় প্রকাশ্যে, কিন্তু তা'র আয় ও সঞ্চয় হয় গোপনে।

কথার-ও যে একটা নিজস্ব দাম আছে, আগের আমলের লোকেরা তা' জানিলেও ব্যবহারে ও কাজে তা' তেমন স্বীকার পান না। এমন কথাও-তো শুনিয়াছি, যা' বুকের মধ্যে আগুন লাগাইয়া দেয়, ঝড় আনে, মনে সমুদ্র-মন্থন করে। একটী দিনের কথা মনে হইল।—

১৯২৪ সালে ফরিদপুরে গান্ধীজি Youth Conference-এ বক্তৃতা দিতেছেন। ভোরবেলা গোটা নয়ের সময় সভা হইতেছিল, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের তাঁবুতেই সে-সভা বসিয়াছিল। মহাত্মাজীর পাশে দেশবন্ধু বসিয়াছিলেন, অসুস্থ শরীর, অল্প অল্প জ্বর, তাই নিয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী বসিয়াই বক্তৃতা দিতেছিলেন। সমস্ত সভা চুপ করিয়া শুনিতেছে। রোগা মানুষ, রোগা হাতের ক্ষীণ তর্জ্জনীটি সভার দিকে তুলিয়া কথা বলিতেছেন—মুগ্ধ হইয়াই শুনিতেছিলাম। বলিতে বলিতে এক সময়ে কহিলেন—'জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে-ই যদি বড় কিছু করিবার ইচ্ছা তোমাদের হয়, তবে একটীমাত্র বিষয়ের দিকে

তোমাদের নজর দিতে হইবে। I have got one simple suggestion—private character.' তারপর থামিয়া বলিতে লাগিলেন—'Violence-এ স্বাধীনতা non-violence-এর চেয়ে আগে আসিবে, এ যদি প্রমাণ করিতে পার—তবে হয় আমি তোমাদের দলে আসিব, নয় পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইব।' তারপর প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিলেন—'I can give my life this very moment if country wants that.' শান্তভাবে বলিতেছেন, কোন চাঞ্চল্য নাই। শুনিয়া মনে হইলে যে, জীবন-দেওয়া জিনিষটী যে কি, তা' ইনি যেন চোখের উপর দেখিতেছেন। এর উপরে যখন অতি ধীর ও শান্তভাবে একটী শব্দের পর আর একটী শব্দ উচ্চারণে অবকাশ রাখিয়া বলিলেন—'Friends believe me, I do not fear death', তখন হঠাৎ টের পাইলাম যে, আমার বুকের মধ্যে কে যেন ভয়ানকভাবে কাঁপিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, ঐ অদূরে ক্ষীণকায় লোকটি যেন চোখের উপরে কাহাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতেছেন; তাঁ'র চোখ শ্রোতাদের দিকে থাকিলেও দৃষ্টি তাঁ'র অদৃশ্য-কিছুতে আবদ্ধ হইয়া আছে। কানে আসিল—'I fear God alone.'

আজও সে-কাঁপনের কথা ভুলি নাই। সত্য কথাই বলিব—একাকী জানালায় বসিয়া যখন এই স্মৃতির কথা লিখিতে গিয়া কলম থামাইয়া গতদিনের সে-ছবি মনে আনিতেছিলাম, তখন সেই দিনের বুকের কম্পন আজ আবার টের পাইলাম। টের পাইলাম যে, শুধু বুকই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে না, আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিতেছে। I do not fear death—কী ক্ষণেই ক্ষীণকণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল যে, আমার বুকের মধ্যে তা' চিরকালের জন্ম বাসা

নিয়াছে। এখন যখনই ঐ ছবি ও কথা মনে হয়, বুকের মধ্যে একটা মানুষ তখনই থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। 'মৃত্যুকে আমি ভয় করি না'—এই কথা কয়টার মধ্যে গান্ধীজি তাঁ'র নিজের অস্তিত্বের অগ্নিময় অমর-অংশ নিশ্চয় কিছু ভরিয়া দিয়া থাকিবেন। তাইতো ঐ-আগুনকে জায়গা দিতে ভিতরে কে যেন আমার আজও ভয়ে এমন কাঁপিয়া উঠে। জানিনা, কথায় এমন অমোঘ-শক্তি ও তা'র জ্বালা কেমন করিয়া কি সুকৌশলে তিনি ভরিয়া দিলেন।

আজ আমি বিশ্বাস করি, মানুষের মনের গভীর-প্রদেশ হইতে এমন কথা বাহির হয়, যা'তে অপরের মন চিরকালের মত জখম হইতে পারে, জ্বলিতে পারে বা আমূল বদলাইয়া যাইতে পারে। এ আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা। কথা যে কত প্রচণ্ড ও ভয়ানক তা' জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু মনের কোন্ গহন-লোক হইতে এদের আনিতে হয়, তা' আজও জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, মনের সেই শক্তির রহস্য-ঘরের সন্ধান কোন দিন পাইবও না। মনের বাহির দুয়ারেই আমরা পড়িয়া আছি, সেখানেই আমরা জীবন কাটাইয়া দেই—ভিতর দুয়ার চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়াই যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও দুর্ভাগ্য এই যে, ভিতরের দিকে যাইবার যে একটা কপাট আছে, তা আমরা জানিও না। এইজন্যই মহাপুরুষদের সঙ্গ প্রয়োজন, কিম্বা বিশ্বাস নিয়া নিজের আপ্রাণ চেষ্টা দরকার। একবার কপাট খুলিতে পারিলে, মনের অমর-দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, সমস্ত ভয় ঘুচিয়া যায়, জীবনের অর্থ একেবারে বদলাইয়া যায়। তখনই কথায় এত জোর হয় যে, পাহাড় পর্য্যন্ত টলিয়া যায়।

*   *   *   *   *

কিরণদা' যাহা বলিলেন, তাহাই নিজের মত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল। বাহিরে অনেকগুলি ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। গট্‌গট্‌ শব্দ করিয়া পায়ের শব্দ দরজার গোড়ায় আসিয়া থামিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। সাহেবী কণ্ঠে হুকুম শোনা গেল—"Open the door".

বাহিরের লোকগুলির বোধ হয় অত্যন্ত জরুরী কাজ, তাই তর সহিতেছিল না। দরজা-খোলার অবসর না দিয়া এবার কড়া-নাড়ার বদলে সশব্দে দরজায় ধাক্কা পড়িতে লাগিল। ধাক্কাগুলির জোর উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল্। মনে হইতে পারে যে, বন্ধ দরজার পাশে আসিয়া অপেক্ষা করিতে হয়—এ সাধারণ নিয়ম আগন্তুকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে-ও প্রযোজ্য হইবে, এ মোটেই পছন্দ করিতেছেন না।

কিরণদা' একটী ছেলেকে কহিলেন—"দেখ্ তো কারা, দরজাটা ভাঙ্গবে নাকি?"

কাহারা—দেখিবার জন্য ছেলেটি দরজা খুলিয়া দিতেই হুড়মুড় করিয়া যাঁহারা ঢুকিয়া পড়িলেন, দেখা গেল তাহারা পুলিশের লোক—দেশী-বিদেশী সাদা-কালোয়-মিশানো বাহিনী। যে-ভাবে ঢুকিল, তা'তে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষের প্রকৃতিতে বন্য পশুটা এখনও টিকিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই কথায় বার্ত্তায়, চলাফেরায় তা বাহির হইয়া পড়ে।

এ-বাহিনীর নেতৃত্বে দেখা গেল স্বয়ং টেগার্ট-সাহেব নিজেই আসিয়াছেন। সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন শিষ্য কলসন্-সাহেবকে। কিছুদিন পরে গুরুর আসন শিষ্য দখল করিবে, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া রাখিয়া যাইতেছেন। সাহেব, সার্জেণ্ট, দারোগা ও পুলিশে ঘরটি ভরিয়া গেল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"Who is Kiron Mukherjee ?"

কিরণদা' জানাইলেন যে, ও-নামের মালিক তিনিই।

টেগার্ট-সাহেব ভ্রূ, কপাল ও চক্ষু কুঁচকাইয়া কিরণদা'কে কিছু ক্ষণের জন্য দেখিয়া লইলেন। এই রোগা, বেঁটে, ভগ্নহস্ত, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ লোকটীকে কিরণ-মুখার্জ্জী বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাঁ'র মন হয়তো চাহিতেছিল না। কিম্বা হয়তো দেখিয়া লইতেছিলেন, এই লোকগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে, যার জন্য সরকারকে হয়রাণ ও ভীত করিয়া তোলে। কর্কশ-ভাষায় জানাইলেন—"You are under arrest".

—"Under arrest ? Where is the warrant" ?"

কিরণদা' ওয়ারেণ্টের কথা জিজ্ঞাসা করায় টেগার্ট-সাহেব বাঁ-হাত দিয়া একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইয়া সেটা কিরণদার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন—"This is the warrant"

দুই পাশ হইতে দুজন হিন্দুস্থানী কিরণদা'র দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

সামনের দেয়ালে একখানা বড় ছবি টাঙ্গানো ছিল, টেগার্ট সাহেবের দৃষ্টি তার উপর গিয়া পড়িল। আগাইয়া ছবিখানা দেখিয়া লইয়াই তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। হাতের ছড়িটা দিয়

ছবিটার উপর উপর্য্যুপরি গোটাকতক বাড়ি দিতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁচ ভাঙ্গিয়া নীচে ছড়াইয়া পড়িল এবং ছবিটাও দেয়াল হইতে ছিন্ন হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। নির্জীব ছবি কোন প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু যে-ছবির উপর টেগার্ট-সাহেবের এত আক্রোশ যে, এতগুলি লোকের সামনে রাগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ছেলেমানুষের মত তা' এইভাবে প্রকাশ করিয়া বসিলেন, এবং যে-ছবিটার উপর এই অত্যাচার ও অপমান দেখিয়া কিরণদার বয়স্ক চোখেও আগুন ঝিলিক দিয়া গেল—সে-ছবির পরিচয় দরকার।

ছবিটি যতীন-মুখার্জ্জীর। তাঁ'র চারজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলিয়া তিনি সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদের সাথে লড়াই করিতেছেন—যুদ্ধের এই ছবিটা একজন আর্টিষ্টকে দিয়া আঁকাইয়া লইয়া কিরণদা' সযত্নে বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা যতীন-মুখার্জ্জীকে টেগার্ট-সাহেব চিনিতেন। তাই ছবিটা দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন এবং খেপিয়া গিয়া এমন কাজ করিয়াছিলেন। অথচ শোনা যায়, এই টেগার্ট-সাহেবই একদিন যতীন-মুখার্জ্জী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন—"He is the only Bengali who fought from trench."—সে ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের কথা।

আজ তিনি বীরের জন্য সে-শ্রদ্ধা রাখিতে পারেন নাই, ইতর লোকের মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়া বসিলেন। বিবেকানন্দের ছাড়া এমন তেজোদীপ্ত ছবি আর কোন বাঙ্গালীর দেখা যায় না। বীরের এই তেজস্বী প্রতিকৃতির সম্মুখে শান্ত থাকাই তাঁ'র উচিত ছিল, এ-ছবিকে অপমান না করিলেও তিনি পারিতেন।

টেগার্ট-সাহেব আজ যে-চেহারা দেখাইলেন, তা'তে অনেক কথাই

মনে আসে। টেগার্ট-সাহেব নিজে সাধারণ ব্যক্তি নন, সামান্য অবস্থা হইতে আজ এত বড় হইতে পারিয়াছেন, কারণ তিনি সত্যই সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। বাংলা তাঁ'র নিকট ঋণী। কলিকাতাকে গুণ্ডার হাত হইতে মুক্তি তিনিই দিয়াছেন। Calcutta Police এক রকম তাঁ'রই সৃষ্টি। সামান্য পুলিশ হইতে ইণ্ডিয়া-কাউন্সিলের মেম্বর পর্য্যন্ত তিনি পথ করিয়া গিয়াছেন। তাঁরই মত লোকের চেষ্টা ও কর্ম্ম-প্রতিভায় সামান্য একটা দ্বীপের অধিবাসীরা এত বড় হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীতে ইংরেজ যে এত বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তা' তো মিথ্যার উপর দাঁড়ায় নাই। বহু সাহসী, অদম্য-উৎসাহশীল ইংরেজ-সন্তানের আপ্রাণ চেষ্টা এর পিছনে রহিয়াছে। মুখের কথায় বা আক্রোশে তো এ-জাতিকে ছোট করা যায় না। এ-জাতির প্রাপ্য সম্মান যা' তা' তা'কে দিতেই হইবে। পৃথিবীর এত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের মত বস্তু দ্বিতীয়টি দেখা দেয় নাই।

ইংরেজ-জাতি বড়, তা'র মধ্যে বড় মানুষ আছে, তা'র মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রতিভা আছে—এ স্বীকার না পাইলে মিথ্যা-ব্যবহার করা হইবে।

কিন্তু সেই জাতিরই প্রতিনিধি-স্থানীয় টেগার্ট-সাহেবের আজিকার ব্যবহার—সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়! বিকলাঙ্গ বৃদ্ধের মুখের উপর পিস্তল তুলিয়া ধরিয়া বীরত্ব এবং একটী ছবির উপর বিজাতীয় আক্রোশ—এ কি বড়র কাজ! ইংরেজের মধ্যে যারা বড়—তা'রাও যদি মানুষের মানদণ্ড হইতে এত নীচে নামিয়া পড়েন, তবে সত্যিই ভাবিতে হয় যে, এই জাতির নীচে নামিবার দিন আসন্ন

হইয়া আসিয়াছে কিনা। মানুষের মধ্যে যা'রা বড়, তা'রা যে জাতিরই হোক, তাঁ'দের মধ্যে একটা দিক থাকে, যা' ভূগোলের ও ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ সীমা ডিঙ্গাইয়া যায় এবং সর্ব্বমানুষের আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। টেগার্ট-সাহেব শোচনীয়ভাবে সে-দিন ঐ সত্যিকার মানুষের পর্য্যায় হইতে চ্যুত হইয়াছেন। অথচ সে-দিন তাঁ'র কতবড় সুযোগ ছিল, মানুষের মহৎ-স্তরে উঠিবার।

হয়তো ভুল করিতেছি। একটি মানুষকে দিয়া যেমন গোটা একটা জাতিকে বিচার করা ভুল, একটামাত্র ঘটনাকে বাছিয়া নিয়া সমগ্র মানুষটাকে বিচার করাও তেমনি ভুল পদ্ধতি। তবু আমার ক্ষোভ থাকিয়া যায়। ইংরেজ যদি তা'র ভালো দিকটা দেখাইত, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তা'র বড় দিকটা-ই ব্যবহার করিত, তবে আমার সত্যিকার উপকার হইত, সেও লাভবান হইত। আমাদিগকে বড় হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সে-ও যে আসলে দুর্ব্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলেই তা' ধরা পড়িবে।

ইংরেজ শত্রুতা করুক, তা'তে আপত্তি করি না। তা'র নিজের স্বার্থ মরণ-কামড় দিয়া রক্ষা করিতে নির্ম্মম ও কঠোর হউক, কিন্তু সে যেন মানুষের স্তর হইতে না নামিয়া যায়। মানুষের সভ্যতার জন্য তা'রও দায়িত্ব আছে। তা'র কর্ত্তব্য সে না করিলে অপরের বোঝা আরও ভারি হইয়া উঠে। ইংরেজ ভারতবর্ষের সঙ্গে শত্রুতা করুক এবং সে-শত্রুতা চিরশত্রুতা হইলেও আমি চিন্তিত হই না। কিন্তু ইংরেজ যখন ছোট হইয়া যায়—তখন তা'র পাপে আমাদের-ও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিতে হয়, এবং মানুষের বদলে পশু সাজিয়া

—ভেটিনিউ

মানুষের সমাজকে যে কোন্ ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের দিকে তথনই আমরা পিঠে বহন করিয়া আগাইয়া চলি—তা' ইতিহাস-বিধাতাই জানেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া শত্রুতা কর—সভ্যতার অঙ্গ-হানি ও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পশুকে দিয়া মানুষকে ঠেকানো, তাতে যে সমস্ত সভ্যতা ও সমাজকে হনন করার জন্য পশুকে লেলাইয়া দেওয়া হয়, তা' বুঝিবার দিন কি আজও আসে নাই?



ডেটিনিউ—

আমার মনের গঠনে নিশ্চয় কোথাও কোন বিষম ত্রুটি আছে, যার জন্য প্রত্যহের দৈনন্দিন ঘটনা আমার তেমন মনে থাকে না। এমন কি বড় বড় ঘটনা পর্য্যন্ত স্মৃতিতে কোন স্থায়ী দাগ রাখে নাই, এ আমি দেখিয়াছি। আমার মন যে-অংশটা দিয়া মনে রাখে, তা'র সেই স্মৃতির ভাঁড়ার-ঘরে নিশ্চয় বড় একটা সিঁধ আছে—সব সঞ্চয় সে-পথে সরিয়া পড়ে, সঞ্চিত কিছু হইতে পায় না।

স্মরণ-শক্তি আর দশজনের চেয়ে যে আমার কম, ঠিক তা' নয়। মনের গঠন-দোষে স্মৃতি-শক্তির স্বভাবই এমন হইয়াছে যে, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার শিকলে যে অতীতকে বাঁধিয়া রাখিবে, সে-রকম চেষ্টা-ই এখানে অতি কম। আমার মনে হয়, এই জন্যই আমার মধ্যে কিছু দানা বাঁধিতেছে না। আমার মধ্যে ইতিহাস নাই, কারণ সময়ের স্বভাব আমার স্মৃতিতে আসিয়া বিকৃত হইয়া যায়। আর সময়-ই তো ইতিহাসের ভিত্তি।

বহুবার অনুসন্ধান করিয়াছি এই মনে-রাখা ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য। দেখিয়াছি—সময় ও স্মৃতি একই জায়গায় মিশিয়া গিয়াছে এবং উহাদের আমি একই বস্তু বলিয়া বোধ করিয়াছি। আর

একটী বিষয়-ও লক্ষ্য করিয়াছি—সময়ের সত্যিকার ধারাবাহিকতা নাই। একটী স্থিতি, একটী 'আছে-'আছে' ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পাই নাই। স্মৃতিকে সরাইলে অতীত বা বর্ত্তমান কিছুই থাকে না। শুধু থাকে একটা "থাকা"। এই "থাকাটা" হইতে সরিয়া আসিলেই মন একে ধরিতে বুঝিতে গিয়া স্মৃতি দিয়া যে-অংশটা পায়, তা'ই অতীত এবং আশঙ্কা ও কামনা দিয়া যা' ধরিতে চায়, তা'ই ভবিষ্যৎ। আসলে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই, কারণ আমি তা'র কোন ভিত্তি-ভূমি ও আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাই নাই।—আমার ভুল-ও হইতে পারে, কারণ—আমি নিজের মন দিয়াই নিজের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ এক অসম্ভব সমস্যা।

মোট কথা, যে-কোন কারণেই হউক মনের একটা জায়গায় বেশ একটু মোচড় খাইয়া আমার স্মৃতি-শক্তিতে ও তার স্বভাবে এ-রকম ঘটিয়াছে, যার ফলে জীবনের ঘটনাগুলি আসে যায় কিন্তু বাঁধা পড়ে না।

তাই এই বন্দি-জীবনের সব ঘটনা এমন ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ঘটিবার সময় ঘটনাগুলি আর দশজনের মত আমাকেও চঞ্চল করিয়াছে, উত্তেজিত করিয়াছে, এবং এমন কি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পর্য্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই শক্তিমান একমাত্র-সত্য ঘটনাগুলি এখন কোথায়? ছায়ার মত কে তা'দের এমন করিয়া সরাইয়া নিল?

এও-তো কম আশ্চর্য্য নয়—একা একা বসিয়া যখন ভাবি, এখন যেমন লিখিতেছি, তখন বাহিরে পৃথিবী এত ছোট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়! এই জেল তা'র সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়া বেমালুম

সরিয়া গিয়াছে—পৃথিবী এত হালকা হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে যে, কলম থামাইয়া নিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া তবে পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ হইতেছি। কিন্তু বাহির তা'র এই জেলখানা-কয়েদী-সিপাহী- কর্ম্মচারী ইত্যাদি সমস্ত নিয়া ছবির মত লাগিতেছে, এর সঙ্গে আমার তো কোন যোগ-ই খুঁজিয়া পাই না!

যখনই একা থাকি, একা ভাবনা-চিন্তা করি, তখনই টের পাই—মানুষ একটা জায়গায় বড় একা। জীবনের ও সংসারের কোন-কিছুই সেই একক মানুষকে স্পর্শ করে না। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের মানুষটীর যোগ সত্য ও স্থায়ী নয়—উভয়ের মাঝখানে মস্তবড় একটী বিদারণ-রেখা রহিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। নিজের যে-একক চেহারা দেখিয়াছি, তা'তে আজ আমার আর কোন সন্দেহ নাই, পরিষ্কার বুঝিয়াছি—আমি ও আমার পৃথিবী এই-দুইয়ের সৃষ্টির মূলে দু'টী বিভিন্ন বস্তু রহিয়াছে। একটীর সঙ্গে অপরটীর গুণে ধর্ম্মে বা প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্য নাই, একটীকে দিয়া অপরটীকে বুঝা যায় না। অথচ কোন গূঢ় কারণে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ দু'টী বস্তু একত্র মিলিয়া এই সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছে। এ-রহস্য উদ্ঘাটন কে করিবে বা আদৌ এ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার কিনা—জানিনা।

যে-মন দিয়া বাহিরের সঙ্গে এবারকার জীবনে লেন-দেন কারবার করিতেছি, সে-মনের স্বভাবের সব পরিচয় পাই নাই। চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু এ-টুকু সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিয়াছি যে, বাহিরে যত ঘটনা ঘটে, তা' বড়ই হোক আর ছোটই হোক, তা'র মূল্য ও অর্থ ঠিক অন্য দশজনের মত করিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

মনই আমার একস্থানে বিকল হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষ ও হানাহানির ঘটনা-বহুল পৃথিবী আমাকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমার মন-ও পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ সত্য-করিয়া গ্রহণ করে না।

জেলখানায় ক্যাম্পে এত ঘটনা ঘটিয়াছে, যা'তে আমাদের মন বিষাক্ত হইয়াছে। ছোটখাটো ঘটনায় ও ব্যবহারে সরকার ও তার কর্মচারীরা এমন প্রকৃতি দেখাইয়াছে যে, সম্মান নিয়া জীবন-ধারণ সম্ভব হয় নাই। মরীয়া হইয়া একটা-কিছু করিয়া ফেলিয়া এই নিত্যিকার অপমানের ও অসহ যন্ত্রণার শেষ দেখিবার জন্য মনে ইচ্ছা জাগে নাই এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। আত্মহত্যা মীমংসার পথ নহে—ভীরুর মত পলায়নের পথ-ও তাকে বলা যায়। কিন্তু সে-পথের আভাস সুস্থ মানুষের-ও চোখে ঝিলিক দিয়া গিয়াছে। ওই-পথই শেষে একমাত্র পথ—সবল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি-ও সেই সিদ্ধান্তকে মাঝে মাঝে মনে আনাগোনা করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু আত্মহত্যাকে অগ্রাহ্য বলিয়া মরীয়া হইয়া অন্য যে-উপায় মন গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে—তা-ও আত্মহত্যার নামান্তর। সম্মানহীন জীবন অপমানে-দুর্ভর হইয়া যখন সহ্যের প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে তখন বুদ্ধি এই পরামর্শই দিত, শুধু আমাকে একা নয়, সবাইকেই যে—মার ও মর।

শুধু টিকিয়া-থাকায় যখন মন সায় দেয় না, তৃপ্ত হয় না, তখন প্রাণের উপর মমতা কমিয়া যায়। সম্মান চাই, মানুষের সহজাত অধিকার চাই, কিন্তু সংঘবদ্ধ শক্তি তা' হইতে দিতেছেনা। মানুষকে যে মানুষের মত হইতে দিতেছে না, পশুর পর্য্যায়ে প্রায় ঠেলিয়া নিয়াছে, তাকে এ-পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেও এবং তুমিও সর, কারণ

তোমরা উভয়েই মানুষকে পশু করিবার জন্য দুই দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছ—বুদ্ধি তখন চিন্তার এই-পথ ধরিয়াই চলিত। নিজে যখন মরিতেই বসিয়াছ, তবে আর মায়া কেন? সময় থাকিতে প্রাণটা দিয়া দাও এবং অপরপক্ষকে-ও সঙ্গে নিয়া যাও যাইবার সময়। —এই মানসিকতা অপরের বুঝিবার পক্ষে সুসম্ভব নহে।

জেলখানায় এতগুলি লোক একত্র মিলিয়া দিন কাটাইতেছে। গল্প-গুজব-হাসি-ঠাট্টা-আড্ডা-হৈ-হৈ ইত্যাদি দিয়া জেলের দিনগুলি পার করিয়া চলিয়াছে। কেহ বা পড়াশুনা ইত্যাদিতে মগ্ন রহিয়াছে। সময় তাদের উপর দিয়া গড়াইয়া পার হইয়া যাইতেছে—পাথরের উপর দিয়া যেমন জলের ধারা যায়। বাহির হইতে দেখিলে বাহিরের লোকের জীবন-যাত্রার সঙ্গে এর তেমন কোন পার্থক্য লক্ষিত নাও হইতে পারে। কিন্তু এর যে-কোন একজনকে ধরিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে পার্থক্য কোথায়, অত্যাচর, শারীরিক ও মানসিক দুই-ই, এদের উপর কতবড় চিহ্ন রাখিয়াছে। নিজের দেশ নিজের বলিয়া পাইতে যে কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা পাইতে হয়—তা' তখন চোখের উপর পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। জন্মিলেই বাঁচার অধিকার জন্মে না—এ-কথা অসম্ভব ও আশ্চর্য্য শুনাইতে পারে, কিন্তু এ যে কত কঠোর সত্য তখন আর সন্দেহ থাকিবে না। সকলেরই জন্মভূমি আছে, সকলেরই স্বদেশ আছে, কিন্তু আমার তা' থাকিতে পারিবে না—এ-কথা মানিতে পারে নাই, তাই শক্তিমানের কতবড় আক্রোশ যে এদের উপর পড়িয়াছে—তখন হয়তো বুঝা যাইতে পারে।

একা একা মন বড় বিষন্ন হইয়া উঠে, ভাবি—এতবড় পৃথিবীতে মানুষের জায়গা কুলাইতেছে. না, একজনের বাঁচা অপরের অন্তরায়

হইতেছে। অমানুষিক এক অবস্থার সম্মুখে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি পৃথিবী, যা' কারু নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বাসের জন্য যেখানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়ু নিয়া মানুষ আসিতেছে—সেখানে তা'র বাসের জায়গায় অভাব নাই, চেষ্টা করিলে অন্নবস্ত্রের-ও অভাব মিটিয়া যায়। কিন্তু মানুষের লোভকে জায়গা দিবে এত বিস্তৃতি এ-ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে নাই। আর সে-লোভ যখন শক্তিতে অন্ধ হয়, বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন সে-শক্তিতে আর-ও যোগান দেয়—তখনই ভয়ঙ্কর অবস্থা দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়।

ইতিহাসের ইঙ্গিত চোখে আঙ্গুল দিয়া কতবড় সর্ব্বনাশকে দেখাইতে চাহিতেছে, কি-পরিণাম যে অপেক্ষা করিতেছে—শক্তিমানের অসংযত লোভ তা' গ্রাহ্য করে না বা দেখিতে পায় না। কিন্তু সৃষ্টির মূলে অমোঘ-বিধান আছে, সেখানে সত্যই কোন ক্ষমা বা মার্জ্জনা নাই।

পৃথিবী এবং তা'র পৃষ্ঠোপরি যে-মানুষগুলি চলাফেরা করিতেছে, তার একটী পরিষ্কার ছবি মনে আনিতে গিয়া দেখি যে—চারিদিক রুদ্ধ, আলো-বাতাস আসার ক্ষুদ্র ছিদ্র পর্য্যন্ত নাই, এমনই একটী আবদ্ধ-কামরার-মত পৃথিবী মানুষগুলিকে ভিতরে বোঝাই করিয়া লইয়া শূন্যে ছুটিতেছে। ভিতরের মানুষগুলি আলোর অভাবে একে অপরের মুখ দেখিতে পাইতেছে না। এই অন্ধকার-আবেষ্টনীর বাহিরে যে একটা বাহির আছে—তা' তা'রা জানে না। আবদ্ধ অন্ধকারে শুধু অসংখ্য নখর ও দন্ত-ঘর্ষণ হইতেছে, আর জানোয়ারের চীৎকার থাকিয়া থাকিয়া উঠিতেছে।

পশুদের কামড়া-কামড়ি-হানাহানি ইত্যাদির একপাশে কি এমন

কোন মানুষ বা শিশু বর্দ্ধিত হইতেছে না, যে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? সে-ই হয়তো একদিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, মাথার উপরের আচ্ছাদন সরাইয়া দিবে—তখন বাহির হইতে আলো আসিবে, মানুষ মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে এবং পশুর নখর-দন্ত অন্ধকারের সঙ্গেই দূর হইয়া যাইবে। সমস্ত মন দিয়াই প্রার্থনা করি —মানুষের সে-মুক্তিদাতা মানুষ আসুক।

আজ এই জেলখানা আমার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী হইতে এ বিচ্ছিন্ন নয়। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইব—এ আবদ্ধ পৃথিবীতে-ই তো থাকিতে হইবে! মনের মধ্যে প্রার্থনা-রত একটী মানুষকে দেখিতেছি—পৃথিবীর জন্য সে মুক্তি চাহিতেছে। কিন্তু ভিতরে-তো দেবতার সেই মাভৈঃ-আশ্বাস শুনিতে পাইতেছি না। মনকে বলি—বিশ্বাস যেন না টলে, মানুষের মহান-ভবিষ্যতে বিশ্বাস যেন দৃঢ় থাকে। সময় হইলে দেবতার কাজ দেবতা-ই করিবেন।

* * * *

তীর্থে দেবতা-ই শুধু থাকেন না, পাণ্ডারা-ও থাকেন। প্রতাপে দেবতাকে ইহারা বহুগুণে ছাড়াইয়া যান এবং ইহাদের দৌরাত্ম্যের সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি-দোষ ঘটে না। দেবতার পাথরের শরীর, এতে হয়তো তাঁ'র কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর—পাথরের দেবতার মত মুখ বুজিয়া সহ্য করার সুবিধা তার নাই। তাই পাণ্ডার প্রতাপে তীর্থ-যাত্রীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

'ইলিসিয়াম রো' আমাদের কাছে তেমনি একটী তীর্থস্থান—

হিন্দুর কাছে কাশী যেমন, অবশ্য ভিন্ন অর্থে। এখানে তীর্থ-দেবতার সাক্ষাৎ মেলে না, মেলে পাণ্ডার দর্শন। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ অধিষ্ঠিত—'ইলিসিয়াম রোতে' কোন্ নাথের অধিষ্ঠান, তা' সঠিক বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, এখানে 'বঙ্গ-নাথ' মানে আই-বি অধিষ্ঠিত।

'ইলিসিয়াম রো' তা'র বিদেশী নাম ছাড়িয়া আজ স্বদেশী নাম নিয়াছে—লর্ডসিংহ-রোড। আই-বি আফিসকে আমরা এই রাস্তার নামেই বুঝিতাম ও বুঝাইতাম।

লর্ডসিংহ-রোডে কারু ডাক পড়িয়াছে, এ-সম্বাদে আমাদের মুখের যে-চেহারা হইত, তা'র সরল বাংলা-তর্জ্জমা এই—'সেরেছে রে।'

বাংলার সেটা সে-দিন, যে-দিন তা'র অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি কুপিত হইয়াছিল ও পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। লর্ড-আরুইনের গভর্মেণ্ট দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে; বণিকের হাতে রাজ-শক্তি আসিয়াছে। ক্লাইভ-ষ্ট্রীট হইতে তখন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। পুলিশের হাতে তখন যে-ক্ষমতা এরা দিয়াছিলেন, তা'তে হিটলার ম্যুসোলিনি ষ্ট্যালিন পর্য্যন্ত ঈর্ষাতুর হইতে পারিতেন। বাংলার বেসরকারী ইংরেজ-মহল সে-দিন বড় কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সৈন্য-পুলিশ-সরকার ইত্যাদির উপর আস্থা রাখিতে না পারিয়া Royalist Party-গঠন করিয়া বাংলার সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার আপনাদের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আর সর্ব্বোপরি স্যার-এণ্ডারসনের লৌহ-হস্ত বরাভয় লইয়া প্রসারিত ছিল।

Statesman-পত্রিকা খুলিয়া পড়িতাম—আমরা born crimi-

nal, আমাদের রক্তে Criminal-দের ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে বহিয়া আসিতেছে। অতএব, একদিনের Statesman-এ দেখিলাম, এই Criminal-দের সমূলে উচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গালার সমাজের মহা ও স্থায়ী হিত-সাধন আশু কর্তব্য। জনৈক ইংরেজ-কর্মচারীর হত্যার পর Statesman ('ও ভারতবন্ধু')-পত্রিকায় দেখিলাম যে, Terrorist-দের উপর justice-ইত্যাদি দেখানোর কথা আর মুখে আনা উচিত নহে; ক্যাম্পে ও জেলে যা'রা আছে, সেই বন্দীদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া আনা হউক, তা'দের দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া গুলি করিয়া মারা হউক।

কেন যে এ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, তা' জানি না। কিন্তু সে-দিন এ-ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন মানসিক বাধা বেসরকারী-ইংরেজের মনে ছিল না—এ আমরা সত্যই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের মনের আড়ালে একটা আশঙ্কা সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল যে, যে-কোন সময়েই দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইবার জন্য ডাকিয়া নিতে পারে—তারপর বুক পাতিয়া গুলি লইতে হইবে।

Statesman-এর আড়ালে সে-দিনের ইংরেজের সরকারী ও বেসরকারী-মনোভাবই গুপ্ত ছিল। বাছিয়া বাছিয়া গুলি করিয়া মারিবার পন্থা সরকার নেয় নাই, এ-সত্য অস্বীকার পাইব না। কিন্তু একদিন পত্রিকা পাইতে দেরী হওয়ায় অস্থির হইয়া Commandant-কে চিঠি দিতে তিনি আফিসে নেতৃ-স্থানীয় কয়েক-জনকে ডাকিয়া নিলেন। তাঁ'রা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁ'দের পিছনে পিছনে আফিসের গুর্খা-আর্দ্দালী পত্রিকা লইয়া আসিল এবং যথাস্থানে রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

ক্ষণপরেই সারা ক্যাম্পে একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া পড়িল। Commandant ডাকিয়া দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, কাগজ তিনি ভিতরে পাঠান নাই, কারণ পত্রিকাতে একটি ভয়ানক দুঃসম্বাদ আছে। হিজলী-ক্যাম্পে রাত্রিবেলা সিপাহীরা ভিতরে ঢুকিয়া গুলি চালাইয়াছে। দু'জন বন্দী মারা গিয়াছে, আহতদের মধ্যে জনদশেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ-সম্বাদে পাছে এ-ক্যাম্পের বন্দীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, সেইজন্যই পত্রিকা দিবার আগে নেতৃ-স্থানীয়দের তিনি ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন।

বক্সা-দুর্গের বারান্দায় বসিয়া সে-দিন কি ভাবিয়াছিলাম, আজ আর মনে নাই। শুধু মনে আছে—তখন পশ্চিমে পাহাড়ের আড়ালে বৈকালের সূর্য্য ঢাকা পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিলাম—দক্ষিণে বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ পড়িয়া আছে, উত্তরে ঘন অরণ্যে অন্ধকার হইয়াছে এবং আকাশে সন্ধ্যাবেলার রক্ত-রঙ্গে মেঘগুলি ছোপাইয়া গিয়াছে। Statesman-পত্রিকা যাহা চাহিয়াছিল, তাহা তবে এই ভাবেই অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে!

দিন আসে, দিন যায়। একদিন সম্বাদ দেখিলাম, চট্টগ্রামে দাঙ্গা হইয়াছে। বেসরকারী ইংরেজ ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ানগণ তাহার নায়ক এবং উত্তেজিত মুসলমান জনতা সে-riot-এ তাহাদের সহকর্ম্মী। আশানুল্লা-হত্যার প্রতিশোধ চট্টগ্রাম সহরের উপর নেওয়া হইয়াছে। তারপর মেদিনীপুরতো রহিয়াছেই। ঢাকা-ও বাদ যায় নাই। প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ দুইপায়ে বাংলাকে চষিয়া ফিরিতেছিল।

এই সেই দিন। লর্ডসিংহ-রোডে ডাক পড়িলে কাজেই আমাদের মুখের ছবি অমন হইত।

আজ সময়ে সে-সব ঘটনা হালকা-ভাবেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে পারিতেছি। এমন কি লর্ডসিংহ-রোডে তীর্থ-যাত্রার অভিজ্ঞতা বেশ ঠাট্টা রসিকতার খোরাক ও বস্তু হইয়াছে। এ নিয়া আলাপ ও গল্প করিয়া জেল-জীবনটায় আরাম উপভোগ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছি। দুঃখ পর্য্যন্ত শেষে হাসির খোরাক যোগায়—সময়ে সবই সম্ভব হয়।—

একজনের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

লর্ডসিংহ-রোডে তা'র কৌতুককর অভিজ্ঞতা বলার আগে তা'র একটু পরিচয় দরকার।

নাম ফণীভূষণ-দত্ত। রোগা-বাঙ্গালীর দেশে এ-রকম শরীর ও স্বাস্থ্য বড় নজরে পড়ে না। মনে হয়—এ-দেশে এ-শরীর যেন বিধাতার আর্ষ-প্রয়োগ। অতবড় শরীর, চোখে-মুখে এমন একটী সজীব সরলতা রহিয়াছে যে, প্রথম-দর্শনেই আত্মীয়তার আকর্ষণ বোধ করা যায়। আর বিস্ময় লাগে যে, এই বয়সে-ও ঐ শরীরের আড়ালে একটী শিশু-মন টিকিয়া রহিয়াছে।

সঙ্গী-হিসাবে ফণীর যুড়ি নাই। কথা বলিবার নিজস্ব একটী ভঙ্গী তা'র আছে যা' সাধারণের থাকে না। রস-জ্ঞান তীক্ষ, নিজের রসিকতা-ঠাট্টা ইত্যাদিও মার্জ্জিত ও সংযত। আলাপ-আলোচনা-আড্ডা এ-সব সরস ও সজীব করিয়া রাখিবার শক্তি তার প্রচুর। ঈর্ষা হয় যে, এমন-ভাবে বলিতে পারিলে অনেক দুঃখ-কষ্টই হালকা করিয়া লওয়া যাইত।

এ গেল তা'র এমন দিক যা' বাহিরের লোকের-ও জানিতে বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু ফণীর আর একটা দিক আছে, যা' সাধারণ

দৃষ্টির বাহিরে। সে তা'র কষ্ট-সহিষ্ণু দৃঢ় দিক—যা' ভাঙ্গা যায়, কিন্তু নোয়ানো চলে না!

দেউলীতে একদিন কথা হইতেছিল অনিদ্রা-রোগ নিয়া। জেলে অনেকেই এ-রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

জীবন-সরকার বলিল—"পঞ্চাদা' আপনি এত দেরীতে উঠেন কেন?"

পঞ্চানন-বাবু কিছুক্ষণ হয় ঘুম হইতে উঠিয়া বিছানায় বসিয়া ছিলেন, কহিলেন—"রাত তিনটার আগে ঘুম হয় না, কি করব। যা-একটু ঘুম আসে ভোরের দিকে।"

ফণী পঞ্চানন-বাবুর পাশে বসিয়াই একটা বইয়ের পাতা উন্টাইতেছিল, বোধ হয় সঙ্গীত-বিষয়ে কোন বিশেষ পুস্তক-ই হইবে। আস্তে কহিয়া উঠিল—"আমারও ইন্‌সমনিয়া।"

শুনিয়া জীবন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। বলার ভঙ্গীতে আমরাও হাসিয়াছিলাম। কিন্তু জীবনের হাসির সঙ্গে আমাদের হাসির তফাৎ ছিল, তা' পরে বুঝিলাম।

জীবন কহিল—"ফণি-বাবু, আপনার সেই ইন্‌সমনিয়ার গল্পটা বলুন না।"

পঞ্চানন-বাবু চাপিয়া ধরিলেন—"বলতো গল্পটা।"

—"না, সে তেমন কিছু নয়। একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম, এখন দেখছি ভাল করিনি! গোপন কথা যত কম বলবেন ততই উপকার পাবেন।"

শেষের উপদেশটা জীবনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল।

পঞ্চানন-বাবু জানালার দিকে ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাক দিলেন—"এই মণ্ডল।"

সামনেই চৌকা, কয়েকজন ফালতু বঁটী পাতিয়া তরকারী কুটিতেছিল। মোটাসোটা বেঁটে হরষিত-মণ্ডল উঠিয়া আসিয়া জানালার ওধারে দাঁড়াইল।

কহিল—"বাবু, ডাকৃতিছেন ?"

—"হাঁ, ডাকৃতিছি। ক' কাপ চা আন্‌তে পার ?"

—"পারি। ক' কাপ ?"

—"এই চার পাঁচ কাপ।"

ফণী জিজ্ঞাসা করিল—"মোণ্ডল, তোমার বুঝি শরীর ভালো নেই। নিশ্চয় মৌতাত জোটে নি ?"

মণ্ডল হাসিয়া ফেলিল। সে চরস-সেবা করিয়া থাকে, বাবুদের কাছে এটা গোপন নাই।

কহিল—"না বাবু, আজকাল পাই। কিন্তু পয়সা বড় বেশী লাগ্‌তিছে।"

—"তা' তো লাগবেই মোণ্ডল, এ যে জেলখানা। কিন্তু মৌতাত পেয়েও তুমি এমন কথা বলছ ?"

কি কথা—বুঝিতে না পারিয়া আমরাও তাকাইয়া রহিলাম।

ফণী কহিল—"তা' না হ'লে তুমি শুধু চা আনতে চাও।"

বুঝিতে পারিয়া মণ্ডল হাসিয়া ফেলিল। কহিল—"এত বেলায় যে টিফিন কিছু আছে তা' তো মনে হয় না। দেখি, কি পাই।"

—"কিছু না থাক ডিমতো আছে ? মামলেট হলেও চলবে। বেশী না, গোটা ছয়েক। তুমি কেমন ওস্তাদ আজ দেখা যাবে।"

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"ম্যানেজার-বাবুকে গিয়ে আমার কথা বল। কিছু খাবার আর চা, বুঝলে ?"

বুঝিয়া হরষিত-মণ্ডল প্রস্থান করিল। পঞ্চানন-বাবু ফণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"কই, তোমার গল্প বল্লে না?"

—"দুঃখ হয়, সে-রকম ইন্‌সমনিয়া আজকাল আর নেই। উঃ—সে কী দিনই গেছে।"

তারপর তার 'সেই-সে-দিনের' গল্প সুরু করিল।

ফণী তখন কলিকাতাতে মুক্তারামবাবু-ষ্ট্রীটের দিকে থাকিত। সময়টা গ্রীষ্মকাল, কিন্তু মাঝে মাঝে বর্ষা গ্রীষ্মের এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে।

বদ্ধঘরের ভিতর শোয়া ফণীর ধাতে সয় না—তায় এই গ্রীষ্মের গরম। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটা মাদুর ও বালিশ বগলে ফুটপাতে আসিয়া একটা জায়গা বাছিয়া বিছানা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িত।

ঘুমের জন্য বেশী সময় সে নষ্ট করিত না। বিছানায় গা দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে পারিত। চোখ বুজিলে শুধু অন্ধকারই আসিত না, ঘুম-ও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িত।

একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে ফণী সে-দিন জায়গা বাছিয়া নিয়াছিল, রাত্রে বৃষ্টি আসিতে পারে এই আশঙ্কায়। পাশেই ফুটপাতের অন্যান্য সরিক গরীব ভিখারীর দলও রাত্রের মত বিশ্রাম করিতেছিল। একটা কুকুর-ও পাশে আসিয়া জায়গা নিয়াছিল।

এক সময়ে একটা হৈ-হৈ শব্দ শুনিয়া ফণীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ মেলিবার আগেই কানে আসে—"গেছেরে গেছে।"

কোথায় কে গেল—দেখিবার জন্য ফণী চোখ মেলিয়া দেখিল, ইতিমধ্যেই প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। এইমাত্র ঘুমাইতে আসিল,

আর শুইতে না শুইতেই রাত্রি শেষ! না, শেষে মনে হইল—এগারোটার সময়ই সে শুইয়াছিল।

কিন্তু হৈ-হৈ ব্যাপারটা কিসের? পাশেই কয়েকটা ভিখারী জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, সামনে রাস্তার উপর গঙ্গা-স্নানার্থী কয়েকটী বিধবা—তা'রাই হায়হায়-চীৎকার করিতেছিল। ফণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল।

তা'কে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া বিধবাদের একজন কহিল—"খুব বেঁচে গেছ বাবা! লাগেনি তো?"

ফণী জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। 'বেঁচে গেছ, লাগেনি ত'—কিছুরই অর্থ সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

—"ষাঁড়ে যে তোমাকে মেরে ফেলেছিল।"

বিধবার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল যে, একটা ষাঁড় কিছুদূরে ফুটপাত ধরিয়া মন্থর গমনে চলিয়াছে। পথের মধ্যে ফণী পড়িয়া যায়—পাশ না কাটাইয়াই ষাঁড়টা সোজা তা'র উপর পা ফেলিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে ফণীর ব্যাপারটা মালুম হইল—এইজন্যই এরা এমন করিয়া চেঁচাইয়াছে।

বিধবাটী অবাক হইয়া কহিল—"বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেছেন। ষাঁড়টা দেখ্‌ছি তোমাকে না মাড়িয়েই ডিঙ্গিয়ে গেছে।"

বাবা বিশ্বনাথের বৃষের এত দয়া! কিন্তু নিজের উরুর দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষুরের চিহ্ন আঁকা, দাগ কাটিয়া বসিয়াছে। কহিল—"না, একটা পা বোধ হয় পড়েছিল। তেমন কিছু হয়নি।"

পাশের এক দোকানদার সবেমাত্র জাগিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া পূব-দিকে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে

নমস্কারটা সারিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। ফণীকে চিনিত, কহিল—"আপনি কিচ্ছু টের পাননি?"

ফণী অপরাধীর মত হাসিয়া কহিল—"না।"

—"এতেও আপনার ঘুম ভাঙেনি?"

—"চেঁচামেচি শুনে জেগেছি। এখন মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে যেন একটা চাপের মত বোধ করেছিলাম।"

—"বোধ করেছিলেন?—অদ্ভুত! এমন ঘুমের কথা বাপের জন্মে শুনিনি, দেখাতো দূরের কথা।"

জখম হয় নাই জানিয়া গঙ্গা-স্নানার্থীরা চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ফণীর ঘুমের সহনশীলতা, যা' বৃষের পদ-মর্দ্দনেও টোল খায় না, তা' নিয়া আশে-পাশে বেশ একটা আলোচনা চলিতে লাগিল।

ফণী মাদুর গুটাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল। সে যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে—এমনই তার মনে হইল। এই রকম ঘুম মানুষের শোভা পায় না—দশজনে এ-ভাবটা তার মনে বেশ গাঁথিয়া দিয়াছিল।

পঞ্চানন-বাবু একটু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যি, তুমি একটুও টের পাওনি?"

—"সত্যি। আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে কেমন ক'রে এ রকম হ'তে পারে। উরুতে খুরের দাগ পষ্ট রয়েছে, মাড়ায়নি বলে যে নিজেকে বুঝ দেব সে-পথও ছিল না।"

তারপর হাসিয়া কহিল—"আজ বিশেষ হয়েছে যে, আমাকে খাঁটি ইনসমনিয়ায় পেয়েছিল। তা' না হ'লে এ-রকম—বুঝতেই পারেন।"

পর্দা সরাইয়া তিলক-সিং প্রবেশ করিল, হাতে চায়ের কেটলী ও খাবার। থালা হইতে দু'টা মামলেট তুলিয়া লইয়াই ফণী কহিল—"উঃ—বেটা, একেবারে আগুন নিয়ে এসেছ।"

জীবন-ও হাত বাড়াইয়া একটা মামলেট তুলিয়া লইল। কহিল—"আপনি যে দুটো নিলেন, এখন ভাগ হয় কি করে ?"

—"নিজে না নিলেই বেশ ভাগ হয়, দুখানা করে দু'জনে পান।"

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"আমি চা খাব। তুমি মামলেট নেও।"

জীবন প্রস্তুত ছিল না, ফণী হাত বাড়াইয়া পঞ্চানন-বাবুর ভাগের মামলেট তুলিয়া নিল। জীবন পারিলে যুদ্ধ-ঘোষণা করিত। কিন্তু ফল কি হইবে জানা-থাকায় আর কোন চেষ্টা করিল না।

বিস্কুটের দিকে চাহিয়া ফণী কহিল—"জীবন-বাবু, একটু অনুপান আনান না।"

—"না, আমি উঠতে পারব না।"

—"কোথায় আছে, তাই বলুন। উঠতে হবে না।"

—"বাক্সের উপর।"

অনুপান কি বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিলাম।

ফণী ডাকিল—"এই তিলক !"

তিলক কাপ ধুইয়া ভিতরে ঢুকিল।

—"যা তো—মাখনের কৌটাটা নিয়ে আয়। বাবুর বাক্সের উপর আছে।"

তিলক বাক্স কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোন বাবুর বাক্সে আছে ?"

—"আরে বাক্সে নয়, বাক্সে।" তারপর তা'কে বাক্স কি বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

—"যা, জলদি আসিস।"

চায়ে চুমুক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ফণী, দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পার ?"

—"ঘোড়ার মত ? না—প্রাক্‌টিস্ করিনি। তবে ক্লাশে ব'সে ব'সে অনেক ঘুমিয়েছি।"

পঞ্চানন-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি চা খাবে না ?"

—"না, ও-তে পদার্থ নেই। পঞ্চাদা', ইন্‌সম্‌নিয়ার আর একটা গল্প শুনুন।"

—"কার গল্প ?"

—"আমারই। জীবন-বাবুদের বলিনি। ঐ গাড়ী-বারান্দার নীচেই শুয়ে ছিলাম। ষাঁড়-pass করার কয়েকদিন পরের কথা। বেশ আরাম করে ঘুমিয়ে ছিলাম। এক সময়ে মনে হ'ল, পা থেকে কোমর অবধি আমার বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। এত অবশ ও ভারী ঠেকছে যে কিছুতেই পা টানতে পারিনে—পা দুটো যেন আমার নয়। অথচ সে-পায়ের জন্যই এত যন্ত্রণা বোধ করছি। এ-রকম নিশ্চয় আপনারাও ঘুমের মধ্যে টের পেয়ে থাকবেন। খুব জোর করে পা টানতে গেলাম—ঘুম ভেঙ্গে গেল, চম্‌কে উঠলাম। দেখি, পা থেকে কোমর অবধি জলে ডুবে আছে।"

—"জলে ডুবে গেছে ?"

—"হাঁ। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। রাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে রাস্তা ডুবে যায়, তারপর ফুটপাত পর্য্যন্ত জল আসে। কখন কোমর অবধি

জলে ডুবে গেল—ঘুমের মধ্যে এই কাণ্ড। এত ঠাণ্ডা আমি কোনদিন টের পাইনি, যেন অর্দ্ধেকটা শরীর বরফ হয়ে গিয়েছে—এমনই লাগল।"

জীবন কহিল—"জলের ছাটেও ঘুম ভাঙ্গেনি?"

—"কথা শুনলেন?—বল্‌ছি, জলে ডুবে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গেনি। আর উনি জিজ্ঞাসা করছেন, জলের ছাটেও ঘুম ভাঙ্গলো না। গলা পর্য্যন্ত জল এলেও ভাঙ্গত না—শুধু নাকটা জেগে থাকলেই হোত। কিন্তু এমন অদ্ভুত ঠাণ্ডা জীবনে ভুগিনি!"

কহিলাম—"ঘুমে তুমি সিদ্ধি লাভ করেছ।"

—"না, জেলখানায় এসে আত্ম-বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে। এ-ইন্‌সম্‌নিয়ার দেখা আর এ-জীবনে পাব না। এখন হাতে এত সময়—অথচ তা'র দেখা পাই না। দরকারের সময় দেখবেন কোন জিনিষ পাবেন না। আর যখন দরকার নেই—তখন দেখবেন বোঝায়-বোঝায় এসে হাজির। কি যে নিয়ম এ-পৃথিবীর!"

ঘরের মধ্যে কে ডাকিয়া বলিল—"পর্দ্দা তুলুন, আ-গিয়া।"

—"এর মধ্যে রোল কল এসে গেল"—বলিয়া জীবন উঠিয়া পর্দ্দাটা তুলিয়া দিল। বুটের শব্দ করিতে করিতে ও-ধারের দরজা দিয়া সিপাই ও রোলকল-অফিসার ঢুকিল, হাতে রেজিষ্টার খাতা ও লালনীল পেন্সিল। প্রত্যেক সিটের সামনে থামিয়া খাতায় দাগ দিতে দিতে আমাদের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কহিল—"ফণী-বাবু, ঘরে যাবেন না?"

—"ঘরে-ই তো আছি। আর হাঙ্গামা করেন কেন? এখান থেকেই দাগ মেরে দিন। পালাইনি—বিশ্বাস করবেন।"

লোকটী নিরীহ ও ভদ্রমানুষ, পুলিশের মেজাজ ও স্বভাব এখনও আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। হাসিয়া কহিল—"নিয়ম জানেন তো—"

—"তা' আবার জানিনে। জান দিতে পারি, কিন্তু নিয়ম ভাঙ্গতে পারি না, তা' জানেন ?"

অফিসারটী হাসিয়া ফেলিল। পঞ্চানন-বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—"আমাদের পিছনেও"—বলিয়া বাকী বক্তব্যটা চোখ ও মুখের ভাবে বুঝাইয়া দিল। পুলিশের লোক হইয়াও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, কোথায় কে কি-রিপোর্ট করিয়া বসে। এ গোয়েন্দার জাল এমনই ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

লোকটী নাম ডাকিয়া বাহির হইয়া অন্য ঘরের দিকে গেল। জীবন হাত বাড়াইয়া পর্দ্দাটা টানিয়া নামাইতেছিল, দেখিল খাতা হাতে অফিসারটী আবার দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিয়া কহিল—"ফণী-বাবু, আপনার একটা অর্ডার এসেছে।" বলিয়া সিপাহীর হাত হইতে ফাইলটা নিয়া একটা কাগজ বাহির করিল।

কহিল—"এটা সই করে অফিসে পাঠিয়ে দেন যেন। যার যার একাউন্ট থেকে টাকা যাবে তা'দের সই দিতে ভুলবেন না।" জীবন অর্দ্ধ-উত্থিত অবস্থায় ছিল, পর্দ্দা ছাড়িয়া কাগজটার জন্য হাত বাড়াইয়া কহিল—"কিসের অর্ডার দেখি।"

ফণী তা'র আগে ছোঁ-মারিয়া কাগজটা নিয়া বাহির হইয়া গেল। জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"ফণী-বাবু, কিসের অর্ডার ?"

ফণী না-থামিয়াই উত্তর দিল—"বোমার।"

অফিসারটী হাসিয়া কহিল—"গ্রামোফোন-কোম্পানীর অর্ডার। একটা গ্রামোফোন আন্‌তে দেন্‌নি? সেটা এসেছে।"

জীবন-ও ফণী-দত্তের অনুসরণ করিল। যন্ত্রটা যা'তে এখনই আনা যায় তা'রই চেষ্টা করিতে বলিল।

এই ফণীদত্ত।

গ্রেপ্তারের পর লর্ডসিংহ-রোডে নীত হয়। সেখানে গিয়া ফণীর মনের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। আর ভালো-থাকার কথা-ও নহে। এখানকার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা শোনা যাইত, তা'তে উৎসাহিত হইয়া উঠা চলিত না।

সময়টা-ও ভালো ছিল না। ঢাকায় গিয়া Lowman-সাহেব গুলিতে নিহত হইয়াছেন; টেগার্ট-সাহেবের উপর ডালহৌসি-স্কোয়ারে বোমা ছোড়া হইয়াছিল, করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ফসকাইয়া গিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, বিপ্লবীদের একজন নিজেদের নিক্ষিপ্ত বোমায় মারা গিয়াছেন।—বাংলার আকাশে তখন ঝড় ছিল।

এ-দিনে লর্ড সিংহ-রোডে যাইতে হইলে মন খারাপ-হইয়া-পড়া অসঙ্গত নয়। সেখানে আদর-আপ্যায়নের যে-সব ব্যবস্থা হইত বলিয়া শোনা যাইত, তাতে গায়ে-কাঁটা দিত—কিন্তু তা' আনন্দে নয়। অন্তিম-কাল আসন্ন হইয়াছে, মনে মনে এ-জন্য প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার দরকার সবাই বোধ করিত।

আমাদের শায়েস্তা করিবার কাজে যিনি সব চেয়ে প্রসিদ্ধি ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁ'র সম্মুখে ফণীকে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। এ-বিষয়ে ভদ্রলোকটী—ভদ্রলোক বলিতে দ্বিধা

হয়—প্রকৃত অধিকারী-পুরুষ ছিলেন। নাম ধরুন গিয়ে—থাক্, নামে আর কাজ নাই, কর্ত্তামশায় বলিয়াই কাজ চালানো যাইবে।

টেবিলের সম্মুখে কর্ত্তামশায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। ফণীকে দেখিয়া চোখ তুলিলেন, ঘাড় উঁচু করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, অনেক অভ্যাসে এ-ষ্টাইল আয়ত্ত হইয়াছে, সহজ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও-চোখে আর কোনদিন দেখা যাইবার সম্ভাবনা নাই। ভয়ানক লোকের সম্মুখে আজ সে আসিয়াছে, আলাপ-ব্যবহারের আগেই শুধু চোখের চাউনী দেখিয়াই ফণী বুঝিতে পারিল—মানুষের পরিচয় তা'র চোখেই লেখা থাকে, এ অতি খাঁটি কথা।

ফণী চেয়ার টানিয়া বসিল। ঠিক করিল, বোবার যখন শত্রু নাই, তখন সম্ভব হইলে চুপ করিয়াই থাকিবে, বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কহিবে না। কি জানি, কোন্ কথায় কি ফল ফলিয়া বসিবে।

কর্ত্তামশায় প্রশ্ন করিলেন—"নাম কি ?"

যার যা' স্বভাব, সে তেমন ভাবেই চলিবে। খোদার উপর খোদগিরি করা চলে শুনিয়াছি, কিন্তু স্বভাবের উপর হাত চালাইবার কথা আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। বুদ্ধি করিয়া বড়জোর স্বভাব-পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—যে-স্বভাব সে-স্বভাবই থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব-গামীরা স্বভাবকে অঙ্গারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যত জলেই ধোয়া যাক তা'র রং নাকি মোছে না। অবশ্য আগুনে দিলে কালো অঙ্গারও লাল হয়, কিন্তু মানুষের স্বভাবে লাগাইবার মত আগুন কিছু আছে কি ?

ফণী বোবার পার্ট প্লে করিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। কারণ তার ঐ-স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যে রসিক লোকটি রহিয়াছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে রাজী হইল না।

কাজেই ফণীকে জবাব দিতে হইল—"শ্রীফণী দত্ত।"

কর্ত্তামশায় 'শ্রী' শুনিলেন, চোখ-মুখের ভাব বিশ্রী করিয়া তা' অগ্রাহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দত্ত ?"

ফণী নিজেকে সংযত করিয়া লইল, কহিল—"ফণী দত্ত"।

—"হু"—কর্ত্তামশায় নামটা বিশ্বাস করিলেন, না সন্দেহটা ঐ ভাবে মুক্ত করিলেন বুঝা গেলনা।

"—বাড়ী কোথায় ?"

—"মাদারীপুর।"

—"যত শালা বাঙ্গাল এসে জুটেছে—"

জিহ্বা শাসন মানিল না, ফণীর মুখ দিয়া বাহির হইল—"যা' বলেছেন।"

—"মানে ?" উচ্চারণে জোর ছিল না, কিন্তু কর্ত্তামশায়ের চাপা-কণ্ঠের প্রশ্ন ফণীর কানে বোমার ধমকের মত শুনাইল।

ফণী যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল—"ঠিকই বলেছেন। এই বাঙ্গাল ব্যাটারাইতো দেশের পিছনে লেগেছে। সুখে থাকতে ওদের ভূতে কিলায়।"

কর্ত্তামশায় বোধ হয় মনে মনে খুব একচোট হাসিয়া থাকিবেন, তাই নিজের এ দুর্ব্বলতায় চটিয়া গিয়াছিলেন। নহিলে পরের কথা গুলি আসে কেমন করিয়া—"দেখ, এ-হাতে অনেক লোক সোজা হয়ে গ্যাছেন, তুমি তো কোন চুনো-পুঁটি।"

ফণী চুপ করিয়া রহিল। চুনো-পুঁটি বলিয়া চিনিয়াছেন, এখন অখাদ্য বলিয়া যদি ত্যাগ করেন, তবে এ-যাত্রা সে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বড়র চরিত্র বড়ই জটিল, হয়তো এই বড় ব্যক্তিটার রুই কাতলার দিকে তত ঝোঁক নাও থাকিতে পারে, চুনো-পুঁটিতেই হয়তো এর রসনায় বেশী রস আসিয়া থাকে।

—"চুপ ক'রে থাকলে চলবেনা, যা জান সব খুলে বল, যদি বাঁচতে চাও।"

—"বেশ, জিজ্ঞেস করুন, কি জানতে চান?" ভাবখানা এই যে, নির্দ্দোষী কেন প্রশ্নকে ভয় করিতে যাইবে, যার মনে পাপ আছে সে-ই কাঁপুক।

তারপর চলিল প্রশ্নের পালা। প্রথম প্রশ্ন শুনিয়া ফণী উত্তর দিল যে, সে কিছু জানে না। দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সেই একই উত্তর দিল। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরেও ফণী তা'র অজ্ঞতা নিবেদন করিল। এর পরেও যখন প্রশ্ন আসিতে লাগিল, তখন ফণী থামাইয়া দিয়া কহিল—"খামোকা প্রশ্ন করে পরিশ্রান্ত হচ্ছেন। যে-জাতীয় প্রশ্ন করছেন, তা'তে আমার উত্তর "না", এটা আপনি এখন অনায়াসে ধরে নিতে পারেন।"

—"আচ্ছা, উত্তর পাওয়া যায় কি না, দেখব। কত 'না' 'হাঁ' হতে দেখলাম। সবাই প্রথম প্রথম ও-রকম গোয়ার্ত্তুমি দেখায়—জানিনা। শেষটা দেখেছি সবই জানে। দেখতে তো ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মত উত্তর কয়টী দিয়ে দাও দেখি।"

ফণী শেষেরটুকু বাদ দিয়ে আগের অংশের পদ-পূরণ করিল—"ছোটকালে দেখতে আরও ভালো ছিলাম, যা বলেছেন।"

কর্ত্তামশায় কহিলেন—"রস দেখি ধরে না। ও রস-টস কিছুই থাকবেনা, কমিয়ে দিচ্ছি।"

ফণী রসের ব্যামো হইতে আরোগ্য হইবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

—"চেহারাটা তো দেখছি গুণ্ডার মত, গায়ে বুঝি খুব জোর?"

ফণী হতাশ হইয়া কহিল—"খুব জোর থেকে আর লাভ হোল কৈ?"

হঠাৎ কর্ত্তামশায় চেয়ারে খাড়া হইয়া বসিলেন, ধমক দিয়া উঠিলেন—"নে ওঠ্, বৈঠক নে।"

ফণী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বৈঠক?"

—"হাঁ, ডন-বৈঠক। নে, উঠে দাঁড়া।"

ফণী উঠিয়া দাঁড়াইল না, বসিয়াই প্রশ্ন করিল—"ক'টা?"

—"ক'টা নিতে পারিস?"

—"আপনি ক'টা বলেন?"

—"আমি? আমি তো বলি ছ'শ'। পারবি?"

ফণী হাসিয়া ফেলিল।

—"হাসছিস্ যে?"

—"হাসছি, ছ'শ'—সে তো দশ বছরের ছেলে-ও পারে।"

—"দশ বছরের ছেলে-ও পারে! তুই ক'শ' পারিস শুনি?"

—"আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ হোলে একসঙ্গে দেড় হাজার।"

—"দে-ড় হাজার? গামাকে হার মানালি দেখছি। যে গুণ্ডার মত শরীর, পারতেও বা পারিস। এই—"

হাঁক শুনিয়া দরজার পাশে সিপাই চমকাইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া

সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—

—"হুজুর।"

—"নে, টেনে তোল তো?"

সিপাই কাছে গিয়া হুজুরের হুকুম মত ফণীকে টানিয়া তুলিতে হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। আড়াই-মণ দেহ-ভারের নোঙ্গর ফেলিয়া ফণী চেয়ারে আটকাইয়া রহিল, সিপাহীর আকর্ষণে বিন্দুমাত্র টলিল না।

সিপাই কহিল—"উঠন।"

কিন্তু আকর্ষণে যে টলে নাই, অনুরোধেও সে অবিচলিত রহিল।

কর্ত্তামশায় কহিলেন—"আর একজনকে ডাক।"

ডাক পাইয়া আর একজন আসিল, দুই সিপাহী একযোগে দুই বাহু-মূলে হাত রাখিয়া ফণীকে ধরিয়া বিস্তর চেষ্টার পরে দাঁড় করাইল। কিন্তু তা'রা ছাড়িয়া দিতেই ফণী স্প্রিং-এর মত গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

কর্ত্তামশায় যেন একটা খেলা পাইলেন, কহিলেন—"ছেড়ে দিচ্ছিস কেন? নে, টেনে তোল্, বৈঠক নেওয়াবি।"

সিপাহীরা পূর্ব্বের মতই অধ্যবসায়ের জোরে অবশেষে দাঁড় করাইল, তাহাকে ধরিয়া নিজেরাও পাশে দাঁড়াইল। এখন বৈঠক লইবার পালা উপস্থিত হইল। কিন্তু বৈঠক লইতে আর হইল না। বেয়ারা আসিয়া সেলাম দিয়া জানাইল, সাহেব সেলাম দিয়াছেন। সাহেবের সেলাম—কর্ত্তামশায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কহিলেন—"যা, সেলে নিয়ে রেখে দে। কাল দেখব, তুমি কিছু জান কি না।"

কর্ত্তামশায় চলিয়া যান দেখিয়া ফণী তাড়াতাড়ি আবেদন জানাইল—"আমার খাবার কথাটা বলে দিন। না-খেয়ে আমি বৈঠক নিতে পারব না বলে রাখলাম।"

কর্ত্তামশায় সিপাহীদের কহিলেন—"এই, বাবুর খাবারের বন্দোবস্ত ক'রে দিস। কি খাবে? রুটি? ক' ডজন লাগবে? দেড় হাজার বৈঠকের জন্য দেড় ডজনের কমে কি হবে?—যা, নিয়ে যা।"

সিপাইদের সঙ্গে ফণী বারান্দায় আসিল। সন্ধ্যা হইতে তখন বড় বেশী বাকী নাই। সূর্য্য দেখা যায় না, পশ্চিমের গাছপালা বাড়ী-ছাদ ইত্যাদির আড়ালে সে নামিয়া গিয়াছে। আকাশে সন্ধ্যার লাল-রং অস্তগামী-সূর্য্যের আজিকার মত কাজ ফুরাইয়াছে জানাইয়া দিতেছে। সামনে আসন্ন রাত্রি। কলিকাতার আকাশ-ও রাত্রির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এ আকাশে-ও অন্ধকারের সঙ্গে দলে-দলে তারা দেখা দিবে, সারা-রাত্র মহা-শূন্যে তিমির-উৎসব চলিবে, যতক্ষণ না পূবদিকে সূর্য্যের মাভৈঃ আলোক-আশ্বাস আসিবে।—আজিকার এই অবসন্ন পরাজিত সূর্য্যই এক সময়ে আবার নূতন দিন নিয়া দেখা দিবে।

ফণীর চমক ভাঙ্গিল, সিপাই বলিল—"চলুন বাবু।"

"চল"—বলিয়া ফণী সিপাহীদের সঙ্গে চলিল।

পাশাপাশি কয়েকটা কুঠরি, সিপাই পাহারা দিতেছে—ভিতরে লোক আছে বুঝা গেল। একটা কুঠরির ভিতরের অধিবাসীকে দেখা গেল, দরজার দিকে পিছন দিয়া ও-ধারের দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হাত দু'টা উপরের দিকে তোলা। বাহিরে

থাকিতে ব্যায়াম করার অভ্যাস বোধ হয় ছিল, এখানে আসিয়া সে অভ্যাস বজায় রাখিতেছে। ফণী মনে মনে না হাসিয়া পারিল না, মানুষ এমনই অভ্যাসের দাস, নইলে পুলিশের এই বন্ধ খাঁচায় ঢুকিয়াও exercise করিতে উৎসাহ থাকে কেমন করিয়া! মনের চিন্তা হঠাৎ মোচড় খাইয়া ভিন্ন লাইনের উপর পলকের জন্য সার্চ-লাইট ফেলিয়া গেল—সত্যই exercise করিতেছে, না আর কিছু!

ফণী আগাইয়া চলিল, চিন্তাটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল—যে যা'র আপন ভাগ্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া লউক, অপরের ব্যাপারে তা'র এ মাথা-ব্যথার দরকার মোটেই নাই।

সামনের সেলে একটী অল্প-বয়স্ক ছেলে কম্বলে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, দেখা গেল। ঘুমের এমনই প্রয়োজন হইয়াছে যে, সময়-অসময়ের ধার ধারে না, সন্ধ্যাবেলাও ঘুম চলিতেছে। ঘুমাও, সব কিছু ভুলাইয়া দিতে এমন জিনিষ আর নাই। কিন্তু এই শৈশবেই মনে ওর এমন কি হইল যে, ঘুমের বিস্মৃতির প্রয়োজন দেখা গেল!

থাক্, অন্যের ঘুমের মধ্যে নিজের চিন্তাকে হেতু-অন্বেষণে পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই, নিজের কুঠরীতে গিয়া এখন ঢুকিয়া পড়।—ফণী সেলে ঢুকিল, দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

ব্যস্, নূতন-জগতের বাসিন্দা সে এখন। এ কী মানুষের জগতেরই একটা অংশ? যে-আকাশ কিছুক্ষণ আগে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে দেখিয়া আসিয়াছিল, এই অন্ধকার আবদ্ধ-শূন্যতায় তা'র কোন অস্তিত্ব আছে কি? আকাশ কি আটকা পড়িয়া বহুপূর্ব্বেই এখানে মরিয়া শুকাইয়া কঙ্কাল হয় নাই? মানুষের আকাশ হইতে অবকাশ লুণ্ঠিত হইয়াছে, আলো চুরি গিয়াছে—তবু ঘটাকাশ

মহাকাশেরই আত্মীয়? মিথ্যা প্রচার করিয়াছ—প্রতারকের দল! আত্মা আত্ম-হত্যা করিয়াছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ সে নয়, হইতে পারে না। উন্মত্ত দানবের বিকারের দুঃস্বপ্ন হইতে প্রলাপের মত তোমরা আসিতেছ।—উঃ, কি অন্ধকার! বাতাস যেন অন্ধকারের চাপে জমাট হইয়া আসিতেছে।—

একা জাগিয়া বসিয়া আছি। পাশের খাটগুলিতে বন্দী-বন্ধুরা ঘুমে অচৈতন্য, অতল অন্ধকারে তা'রা তলাইয়া গিয়াছে। রাত্রি মধ্য-প্রহরের সিংহদরজা পার হইয়াছে, উপরে তারার আলোগুলি মহাশূন্যে জ্বলিতেছে। লণ্ঠন-হাতে পুকুরের ও-পাড়ে জেলের সিপাই পাহারা দিতেছে—অন্ধকারের অন্ধ অনুচর।

সব আলো যদি নিভিয়া যায়, কোথাও যদি এক-ফোঁটা আলো না থাকে—তবে কি সব অন্ধকার হইয়া যাইবে? তখন কি অন্ধকারের কোন দ্রষ্টা থাকিবে না? এতকাল জানিয়া আসিয়াছি, আলো না-দেখাই অন্ধকার দেখা, তাই চোখ বুঝিলেই অন্ধকার আসে। কিন্তু এ-ভাবে নয়, একান্ত অন্ধকারকেই দেখিতে পারা যায় মনে হইতেছে—যেমন আলোককে দেখা যায় ঠিক তেমনি। আলো অন্ধকার দুইই দেখার বস্তু, দ্রষ্টা বা দর্শনের সঙ্গে বোধ হয় এর কোন যোগ নাই। এই আলো অন্ধকার উভয়কেই প্রকাশ করে, সে-আলো তবে কোথায় থাকে? বাহিরে তাহা নাই, তা জানি। কিন্তু বাহিরের এই আলো-অন্ধকারের হাত এড়াইয়া কেমন করিয়া যে সে-ভিতরটায় যাওয়া যায় বুঝিতেছি না।

শুধু পিপাসাই রহিয়া গেল, সে গোপনে আলোককে কি কেহ কোনদিন প্রকাশ্যে বাহির করিয়া আনিতে পারিবে না?—চোখ মেলিয়াই অসহায়ের মত অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছি।

রাত্র গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। দূরের রাস্তায় হর্ণ বাজাইয়া মোটর ছুটিয়া গেল। আলিপুরের পশুশালায় বাঘ ডাকিয়া উঠিয়াছে—খাঁচায় থাকিয়া ঘুমের মধ্যে বোধ হয় বনের-স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

জেল-গেটে ঢং করিয়া শব্দ হইল। রাত্রি একটা বাজিয়াছে।

ডেটিনিউ—

আমাদের কবি বলিয়াছেন—'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।'—জেলখানায় আসিয়া এ-জিনিষটীর প্রকোপ বড় বেশী দেখিতেছি। বাহিরে থাকিতে বহু-রকম মানুষের সঙ্গে কারবার করিতে হইয়াছে, ছোট-বড় নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বহু-ব্যস্ততার মাঝে নিজেকে নিয়া দু'দণ্ড বসিবার ফুরসৎ মেলে নাই।

কিন্তু এখানে অবসর প্রচুর—অনেকের নিকট তা' অসহ্য। এই অবসর নিয়া তা'রা কি করিবে ঠিক পায় না—রীতিমত হাঁপাইয়া উঠে। এখন অবসর মিলিয়াছে, বাহিরের পৃথিবী দৃষ্টি ও সমস্ত মনোযোগ অবরোধ করিয়া নাই—সরিয়া গিয়াছে। মস্ত-বড় একটা অবকাশের মধ্যে আমাদিগকে আমরা ছাড়া পাইয়াছি। এবং আপনাকে ঘিরিয়াই ঘুরিতেছি।

কিন্তু এই আমি-বস্তুটি কি—তা' সঠিক বা বেঠিক কোনটাই আমি অন্ততঃ জানিতে পারি নাই। চেষ্টা করি নাই—তা' বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিতেছি না। নিজেকে নিজে ধরিতে পারিতেছি না। ব্যাকরণের-ভাষায়, কর্ত্তাকে

কৰ্ম্ম-হিসাবে কিছুতেই প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। যে-বস্তু দিয়া ধরিব—সে হইল আমার নিজের ইন্দ্রিয়। তা'র সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই সে ধরিতে পারে, গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যিনি কর্ত্তা তিনি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের পিছনে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের মুখ কখনও তা'র দিকে ফিরানো যায় না। ইন্দ্রিয় ঘুরিয়া হয়রাণ হয়—কর্ত্তা কিন্তু সর্ব্বদাই কেন্দ্রে থাকেন।

কোন কিছু জানা মানে তা'কে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বস্তু করা। ঐ করার জন্য যে-কর্ত্তাটির প্রয়োজন, সে জানার আদিতে থাকে, অন্তে মানে সম্মুখে থাকে না। সুতরাং আমি-বস্তুটীকে 'আমির' পক্ষে জানা-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে-পাওয়া কখনও সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়ের অতীত অতীন্দ্রিয়-করণ যদি কিছু থা'কে যা'তে 'আমি' নিজেই আমার কর্ম্ম হয়—তবে সে আলাদা কথা। শুনিয়াছি, সে-জন্য অধিকার থাকা দরকার করে। শুধু তা'তেই হয় না—নিরন্তর সযত্ন-সাধনার বা অভ্যাসের-ও একান্ত প্রয়োজন হয়। আমরা সাধারণ লোক—অধিকার বা সাধনা কোনটাই আমাদের আয়ত্তে নাই।

তবু আমরা 'আমাকে' ঘেরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। এতকাল সংসারের সংঘর্ষের মাঝখানে ছিলাম, শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য পৃথক-ভাবে চেষ্টা করি নাই। লড়াই করিতে করিতে আঘাত পাইয়াছি ও দিয়াছি; এই-ভাবেই কাহারও শক্তি বাড়িয়াছে, কাহারও বা শক্তি হ্রাস হইয়াছে—এ ব্যতীত শক্তি-সঞ্চয়ের কোন পন্থা আমরা অনুসরণ করি নাই বা করিতে পারি নাই।

এখন নিজের সম্বন্ধে একটা হিসাব-নিকাশ করিতে অনেকেই ব্যস্ত আছেন। ইচ্ছা করিয়াই যে আমরা এ-কাজ করিতেছি—তা' নয়।

এই দীর্ঘ অবসরের চাপে নিজে নিজের একান্ত-মুখোমুখী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি। তাই আপনাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে হইতেছে—অন্য কোন দর্শন-যোগ্য বস্তুর অভাব হইয়াছে বলিয়াই। নিজের পরিচয় নিজের জানা দরকার—এ-কথা এই অবকাশ আমাদিগকে বিষম-ভাবে জানাইয়া দিতেছে। নিজের পরিচয় লইতে গিয়া অনেকেরই অস্তিত্বের ভিত্তি-মূলে নাড়া লাগিয়াছে। আমি নিজে সেই-অনেকের একজন।

আমার চেহারাটী ইচ্ছা করিলে আয়নার সামনে দাঁড়াইলেই দেখিয়া লইতে পারি। কিন্তু ভিতরের চেহারা দেখিব সে-রকম কোন আয়না হাতের কাছে পাওয়া যায় না। যখনই নিজের সম্বন্ধে সজাগ হই, তখনই দেখিতে পাই যে, নিজের ইচ্ছা-কামনা ইত্যাদিতে নিজেকে প্রতিফলিত করিতেছি এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খা-বাসনা ইত্যাদিও কখন এক-ভাবে থাকে না, নিত্য এরা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সর্ব্বদা-পরিবর্ত্তন-স্বভাব ইচ্ছাগুলির উপর আমার নিজের যে-প্রতিচ্ছবি পড়ে—তাহাও এক নহে, আমার সে ভিতরের রূপ-ও কেবলই বদলাইয়া চলিয়াছে।

ফলে, মনে একটা বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিয়া দৃঢ় হইতে থাকে যে, আমার হয়তো কোন স্থায়ী-রূপ নাই, হয়তো আমি এক-বোঝা বাসনা কামনার সমষ্টিমাত্র। জমানো-বরফ যেমন গলিয়া জলধারা হইয়া নামে, আমিও বোধ হয় ইচ্ছা-বাসনা সমূহে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছি। মোটকথা, আমার চারিপাশে এমনই একটি পরিমণ্ডল রহিয়াছে, যে-পরিমণ্ডল কামনা-আকাঙ্খার নানা আলো বাতাসে তৈরী, যাহা অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াও যায় না, কিম্বা

যাহা ঠেলিয়া পথ করিয়া কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়াও যায় না। যতবার যে-ভাবে যে-দিক দিয়াই চেষ্টা করিয়াছি, এই একই অভিজ্ঞতা কেবল লাভ করিয়াছি যে, আপনাকে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।

নিজেকে জানার-চেষ্টা যখন বারম্বার একই অভিজ্ঞতায় আসিয়া থামে, তখন সে-দিকের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়, অন্তত হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। তখন দেখিতে পাই যে, বুদ্ধি যেন স্থির হইতে চায়, তা'র চঞ্চলতা কমিয়া আসিতে থাকে। আমার মনে হয় যে, তখন বুদ্ধির মধ্যে একটী উদ্বৃত্ত-জমি পাওয়া যায়—যেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ানো চলে। ফলে, শক্তি-বৃদ্ধি হয় এবং তখন জীবন-সম্বন্ধে ব্যবহার দ্বিধা ও কুণ্ঠাশূন্য হইয়া আসে। এতে এই লাভ হয়, আনন্দ না-মিলুক শান্তি অন্ততঃ পাওয়া যায়—যেখানে সুখ-দুঃখ আন্দোলন ও বিক্ষোভ না-তুলিয়াই তা'র দেয় যা' তা' দিয়া যায়।

এর কারণ আছে। যখন নিশ্চিন্ত জানা যায় যে, আমিকে-ধরা সম্ভব নয়, মানে আমি আমার-বাহিরে যাইতে কখনই পারি না, পরিধি-পার হইতেও পারি না বা কেন্দ্রে-লগ্ন হইতেও পারি না—তখন এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়া সমস্ত অস্তিত্বে সংক্রামিত হয়। নূতন-তাজা রক্ত-বৃদ্ধি যেমন সবলতর স্বাস্থ্য আনে, এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও তেমনি নূতন-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলে।

এ গেল নিজেকে জানার বিষয়ে যে-দিকটা অজ্ঞেয় বা অসম্ভব। আর বাকী থাকে পরিচিত দিকটা—যেখানে সংখ্যাহীন আশা-আকাঙ্খার সমষ্টি আমি। বুদ্ধির স্থিরতা-লাভের পরে এইগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে তত বেগ আর পাইতে হয় না।

নিজের জোরালো কামনাগুলিকে প্রধান্য দিয়া disciplind ও organised করিয়া লইবার তাগিদ আসে তখনই। যে তাড়াতাড়ি তা' সারিয়া নিতে পারে—জীবনের ক্ষেত্রে ভাগ্যকে জয় করিয়া লওয়া তা'রই পক্ষে সম্ভব হয়। যদি মানসিক গঠন অনুকূল হয়, বহুর জন্য সফল-ভাবে আত্ম-নিয়োগ সেই ব্যক্তি-ই করিতে পারে। নতুবা নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই সুখী বা বড়-করিবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত থাকে এবং সফল হয়ও। এ-সব ব্যক্তি চরিত্রবান বা মন্দ ইত্যাদি প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে।

এতকাল নিজের সঙ্গে নিজ জীবন-যাপন করিলাম, অথচ সেই নিজেকে জানিতে পারি না—এ আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য মনে হয়। জন্ম হইতে এই এত-দিন পর্য্যন্ত নিজেকে নিয়া কাটাইয়াছি, একটা ক্ষণ-ও নিজে নিজের সঙ্গ-ছাড়া থাকি নাই—এ সত্বেও আমারই কাছে আমি অজ্ঞেয় থাকিয়া যাইতেছি—একটু যখন মনোযোগ দিয়া ভাবিতে বসি, সত্যই এ আমার নিকট রহস্যময় লাগে। কেমন-তর একটা অভূতপূর্ব্ব-রসে মন আবিষ্ট হইয়া আসে।

আবার অনেক সময়ে একটা অন্ধ-আক্রোশেও উত্তেজিত ও অস্থির হইয়াছি। এই অস্তিত্বের-পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্তরালে কোন রহস্য রহিয়াছে, একবার দেখিয়া লইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আমি আমার নিকট ভয়ানক-ভাবে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, কোন-দিক দিয়াই মুক্তির সামান্য-তম ছিদ্র-পথ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারি নাই। নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া উঠিব, নিজের-অতীত একটা আশ্রয় পাইব যেখান হইতে নিজেকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে পারিব—এ আমার নিকট আজ

পর্য্যন্ত অসম্ভব চেষ্টা হইয়াই রহিয়াছে। অসম্ভব, তবু মন নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। একটা কিনারা সে করিবেই, হার মানিবে না—মনের এই দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে এই দৃঢ়তা দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছে। নিজের সত্য-পরিচয় কি—এ না জানিয়া মন তৃপ্তি বা শ্রান্তি কোনটাই মানিবে না। আমি জ্ঞানতঃ কোন চেষ্টা না-করিলেও মনের এই চেষ্টা চলিতে থাকে—এও আমি লক্ষ্য করিয়াছি। নিজেকে জানা—হয়তো এ-অসম্ভব সম্ভব হইতেও পারে একদিন।

নিজের কথা ভাবিতে বসিয়াছি।—রাত্র প্রায় একটা বাজে। Corridor-এ ইলেকট্রিক-আলো জ্বলিতেছে—পর্দ্দা ঠেলিয়া তা' ঘরে আসিতে পারিতেছেনা। সিলিং-এ খানিকটা জায়গায় সাদা-আলো আসিয়া পড়িয়াছে। হারিকেন-লণ্ঠন জ্বালিয়া নিয়া লিখিতেছি। রাত্রির ও ঘুমের গভীর-স্তব্ধতা ও প্রশান্তি জেলখানায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। নিজেকে নিজের চিন্তার বিষয়-বস্তু করার এই তো উপযুক্ত সময়।

নিজের কথা কত যে ভাবিয়াছি—তা'র সীমা নাই। নিজেকে নিয়া কি করিব, কি করিতে পারিলে মন তৃপ্ত হয়—বুঝিতে চাহিয়াছি। কি হইতে পারিলে নিজের চরম প্রকাশটী লাভ করা যায় এবং তেমনটী কোন-পথ ধরিয়া চলিলে হইয়া উঠা যায়—ভাবিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। এই ভাবেই দিনের পর দিন পার করিয়া জীবনের এতগুলি বৎসর অতিক্রম করিলাম। আয়ুর পুঁজিতো

ইতিমধ্যে অর্দ্ধেকটা ক্ষয় করিয়া আনিয়াছি। যাহা কাম্য ছিল, তাহা কি ছিল,—বুঝিতে কি পারিয়াছি বা পাইয়াছি? যাহা হইয়া উঠার লোভ ছিল—তাহা কি জানিতে পারিয়াছি বা হইয়া উঠিয়াছি? কি-করিয়াছি এবং কি-হইয়াছি—এ-প্রশ্নের জবাব জীবনের মাঝামাঝি আসিয়াও দিতে পারিতেছি না।

নিজের আদি নিজে দেখি নাই, তা' সম্ভবনয় বলিয়াই—কারণ নিজের জন্মের-দ্রষ্টা নিজে হওয়া তো কখনও সম্ভব হয় না। নিজের শেষ-ও নিজে দেখিতে পারিব না—কারণ নিজের মৃত্যুর-দ্রষ্টা নিজে হইব, সেও-তো অসম্ভব। আমার আদি থাকিলে আমি তা' জানিতাম, আমার অন্ত থাকিলে তা'ও আমার অজানা থাকিবে না—কারণ, যাহা আমার অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না, আমার বিষয়ে তাহা কখনও ঘটে না।

চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারি—আমার আদি বা অন্ত কোনটাই নাই। কিন্তু এ যদি অভিজ্ঞতার বিষয় হইত, শুধু চিন্তার ও যুক্তির সীমায় আবদ্ধ না থাকিত, তবে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতাম। সীমাবদ্ধ খণ্ডিত-জীবনে আমার অসীমত্বের আস্বাদন পাইতাম। তখন বুঝিতাম—এক-দিকে আমি পরিবর্ত্তনশীল ও অন্তবিশিষ্ট, অন্য-দিকে আমি শাশ্বত ও আদি-অন্তহীন। এই সীমায় ও অসীমে তখন ইচ্ছামত দোল খাইতে পারিতাম। কোন দুঃখ, কোন নালিশ, কোন জ্বালাই আর থাকিত না।—কি হইতে পারে, তা' থাক। কি হইয়াছে ও হইতেছে—তাহাই আর একবার ভাবিতে বসি।—

কথাটা পুরাণো কিন্তু সত্য। শৈশবে মানুষের জীবনে এমন

কতকগুলি ছাপ পড়ে যা' সমস্ত ভাবী-জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করে। যে-সমাজে আমরা বাস করি তা'র প্রভাব শিশু-মনে এমন দৃঢ় থাকে যে, তাহা ছাড়াইয়া-উঠা সম্ভব হয় না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই প্রভাবগুলি সমস্ত কাজ-কর্ম্মে ও চিন্তায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সমাজের চেয়ে যে-পরিবারে আমরা জন্ম-লাভ করি, লালিত ও পরিপুষ্ট হই, তা'রই প্রভাব বহু-গুণে বেশী প্রবল ও স্থায়ী। পরিবারের প্রভাব যে কত বড় হইতে পারে তা'র উদাহরণ আমার জীবনেই রহিয়াছে।

আমাদের পরিবারটা স্বদেশী পরিবার। সে 'স্বদেশী' উগ্র-পন্থী। স্কুলে নীচের ক্লাশে পড়ি, তখন এক দাদা ধরা পড়েন। গ্রামসম্পর্কে এক দাদা, আমাদের বাসাতেই থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন—তিনিও গ্রেপ্তার হন। গুর্খাপুলিশ-দারোগা-সাহেব ইত্যাদিতে বাড়ী বেষ্টন করিয়া রাজসিক সমারোহ ও দাপট দেখাইয়া গেল। সে-দিনের বালকের মনে যে-ছবি আঁকা হইল আজও তা' মুছিল না। শুনিলাম, বোমা-পিস্তল খুঁজিতে এরা আসিয়াছে। দাদারা নাকি সাহেব খুন করিবে, এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে—তাই বোমা-পিস্তল যোগাড় করিয়া মজুত করিয়াছেন। এমন কি, দাদারা নাকি টাকার জন্য ডাকাতিও করিয়া থাকেন।

এক-দিনেই দাদাদের চেহারা বদলাইয়া গেল। যে ছিল আমার দাদা—সে এক-দিনে অসামান্য হইয়া দেখা দিল, এমন কি অপরিচিত-প্রায়ের মত তা'দের দেখিতে লাগিলাম। মানুষের এর চেয়ে বড় চেহারা সে-দিন আমার কল্পনায় আর ছিল না।

তারপর বালেশ্বর-লড়াইয়ে যতীন-মুখার্জ্জী মারা গেলেন, দুই দাদারই ফাঁসি হইল। জীবনে এই একটী ঘটনা সে-দিন ঘটিল—যা'র

ফলে আমার জীবন আগা-গোড়া বদল হইয়া গেল। আমার আজিকার জীবন সেই ঘটনারই পরিণতি।

সেই মৃত্যুকে আমি বহন করিয়া চলিয়াছি এই দীর্ঘদিন যাবত। বহন করিতেছি বলা ঠিক হইবে না—সেই মৃত্যু আমাকে ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে এবং আজিকার দিন পর্য্যন্ত আনিয়াছে। বাকী দিন কয়টাও ঐ একই ইঙ্গিতে চলিতে হইবে, এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

শৈশবের প্রভাব জীবনের মূলে থাকিয়া কি-ভাবে গোটা জীবনকে চালিত করে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলে আমার মত সবাই বুঝিতে পারিবেন। নানা-ভাবে নানা-দিকে ছুটিয়াছি, কিন্তু শেষটা সেই একই পথে আসিতে হইয়াছে। মনের রক্তে যাহা মিশিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া বৃথা চেষ্টা ও পণ্ডশ্রম হইয়াছে বহুবার দেখিয়াছি। ব্যক্তিগত লোভে কামনায় যে-পথেই পা বাড়াইয়াছি, সব পথ-ই ঐ এক পথে আসিয়া মিশিতে দেখিয়াছি। শৈশবে অস্তিত্বের গোড়া-ঘরে যে-মূলধন সে-দিন সে-মৃত্যু সঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, যক্ষের মত আমি তা' পাহাড়া দিতেছি, জীবনে সেই একমাত্র মূল-ধন সম্বলেই কারবার চলিয়াছে। অন্য সব দান গ্রাহ্য হইতে পারিতেছে না।

নিজের কথা বলা রুচি-সম্মত নয়—জানি। এও জানি, নিজেকে যে লোপ করিতে পারে, সে নিজের বৃহত্তম ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু নিজেকে সত্য-সত্যই লোপ করা সহজ নয়, যা'রা একটু চেষ্টা করিয়াছেন তা'রাই তা' টের পাইয়া থাকিবেন।

এ জানিয়াও নিজের কথা লিখিতেছি, এর একমাত্র কারণ আমি আর দশজনের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ। মানুষের যে-সব পতন-ত্রুটি হইয়া থাকে, তা' আমারও অল্পবিস্তর হইয়াছে। সাধারণের মতই কোন কোন বিষয়ে বা কোন কোন সময়ে আমি ভয়ানক দুর্ব্বল ও অক্ষম প্রতিপন্ন হইয়াছি। আবার তা'দের মতই কোন বিষয়ে বা কোন সময়ে হয়তো চরিত্রে তেজের ও শক্তির পরিচয় দিয়াছি। আমার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই, বিশেষ মোহ নাই—আমি জানি, আমি যে-স্তরের মানুষ সেখানে দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা এমন কি হীনতা পর্য্যন্ত নিত্যকার ব্যাপার।

একাকী থাকিতে হয়, সঙ্গী সাথীর অভাবে নয়, মনের স্বভাবের জন্য। সময় কাটাইবার জন্য এক রকম খেয়াল-বশেই কলম লইয়াছি, স্মৃতির পাতায় তা'দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছি। পড়া-শুনা ইত্যাদির অবসরে রাত্র যখন একটু বেশী হয়, পাশের অন্যান্য ঘরে বাতি নিভাইয়া সবাই যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন কলম নিয়া স্মৃতির পথ ধরিয়া চলি। চলিতে চলিতে সে-পথ যদি এক সময় আমার ব্যক্তিগত জীবনের দরজায় আসিয়া থামে—তবে পাশ কাটাইবার কোন কথা আমার মনে আসে না। যে-আমি একদিন ছিলাম, আজ আর নাই—সেই আমির দুয়ারে আজিকার আমি আসিয়া থামি। মৃত-আমিকে দেখিবার জন্য যদি দু'দণ্ড তা'র পাশে দাঁড়াইয়া যাই, তবে তা'তে সত্যিই দোষের কিছু থাকে কি যা'তে রুচিতে আঘাত লাগিতে পারে? আমার তো মনে হয় না।—

সাত বছর আগে একদিন বেলা এগারোটার সময় গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসি। ভাই-বোন্‌রা সকলে এবং সহরের অনেকে জেল-গেট

পর্য্যন্ত সঙ্গে আসে। জেল-গেট বন্ধ হইলে তাহারা চলিয়া যায়। একটী ঘরে গিয়া নিজের জায়গা লই।

জেল আমার কাছে নূতন নয়। নূতন হইলেও যে মন বিশেষ চঞ্চল হইত, এ আমার মনে হয় না। ঢুকিবার মুখে ভাই-বোনদের হাসিমুখেই বলিয়া দিয়াছি যে—যা, ভাবিসনে, ছ'মাসের মধ্যেই ফিরে আসছি।—তখন ঐ রকম বিশ্বাসই ছিল।

মাদারীপুরের এ ছোট জেলে ঢুকিয়া মনে বিশেষ একটী ভাব বেশ কতক্ষণ স্থায়ী ছিল, সাত বছর পরেও তা' আজ মনে করিতে পারিতেছি।

দাদারা ষড়যন্ত্র-মামলায় ধরা পড়িয়া এই জেলে কয়েকদিন ছিলেন --১৯১৩ কি ১৪ সাল হইবে। স্কুলে যাইবার আগে রোজ বাসা হইতে তাঁ'দের খাবার এখানে পৌছাইয়া দিয়া যাইতাম। জেলের গরাদের পাশে তখন তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইতেন। এই ছবি মনে আসিতেছিল, আর এই কথাই মন ভাবিতেছিল—সেই দিনের সে-বালক আজ বড় হইয়া নিজে জেলে আসিয়াছে, এবার তা'র জন্যই হয়তো সন্ধ্যার সময় ছোটভাইরা খাবার নিয়া আসিবে। এবং সে-দিনে গরাদের পাশে যাঁরা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাঁহারা আজ এ-পৃথিবীতে নাই, কে জানে কোথাকার অদৃশ্য-জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁ'রা নীচের পৃথিবীর জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করিতেছেন। মনে একটু ভয়ের সঙ্গে কথাটা খেলিয়া গেল, তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে? আজ যে-ভাইরা খাবার নিয়া আসিবে, তা'রাও একদিন শেষে এই ভিতরে আসিবে এবং আমি পৃথিবী হইতে সড়িয়া পড়িয়া সেই অদৃশ্য-বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইব?—

ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই। কিছুক্ষণ এই ভাবনাগুলিই মনকে দখল করিয়া ছিল—আজও তা' স্মরণ করিতে পারিতেছি।

মাদারীপুরের জেলে দু-রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, এ-কথাটা ভুলি নাই। আর মাদারীপুর ত্যাগ করিয়া আসার ছবিটিও মনে রাখিতে পারিয়াছি।

আমি কবি নয়, কবিতা লিখিও নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি ও রুচি আছে। বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমার মন আকৃষ্ট হয়, কারণ তা'তে আমার মনের তল-দেশ পর্য্যন্ত আলোড়ন পৌঁছায়। মানুষের মুখ, যত সুন্দরই হউক, আমাকে আকৃষ্ট করে না। যে-মুখ বা যে-অবস্থা বিশেষ ছবি ও রূপের প্রতীক হয়, বিশেষ ভাব বহন করে—তাহাতে অবশ্য মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বাহির পৃথিবী যে-অনায়াসে আমার মন টানিয়া লয়, যে-অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন সরাসরি হৃদয়ের অন্দর-মহলে যে-ভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তা'তে অনেক সময়ই আমি ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি যে, এ ভালো লক্ষণ নয়, গুরুতর কর্ত্তব্য-পালনের সময় তো এরা বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। মনকে তৈরী করা কর্ত্তব্য, বাহিরে সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতা হইলেই যে ধরা-পড়ার বদ অভ্যাস—এ মনের ব্যাধি-বিশেষ, এর চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু আজও সে-রোগ সারে নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। সুযোগ ও অবসর যদি পাই তবে এ-বিষয়ে বিশদ-ভাবেই বলিব, কারণ এ-দিক দিয়াই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমুদ্র-মন্থন মনে ঘটিয়া গিয়াছে। আজ সে-কথা থাক্। সে-দিনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনটীর জন্যই মাদারীপুর ত্যাগ করিবার ছবিটী আমার মনে রহিয়াছে।

রাত্র সাড়ে-ন'টার মত হইবে, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলাম। এমন সময় সিপাহী আসিয়া ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ?"

—"আপনাকে দারোগা-বাবু সেলাম দিয়েছেন।"

—"কোন দারোগা-বাবু ?"

—"থানার বড় দারোগা-বাবু।"

থানার বড় দারোগা-বাবু এই রাত্রিবেলা সেলাম দিতে আসিলেন কেন, জানিবার কৌতূহল হইল, কিন্তু উত্তর করিলাম—"বলগে যে, রাত্রে এখন উঠতে পারব না ; ভোরে আসেন যেন।"

অনুরোধ বহন করিয়া সিপাহী চলিয়া গেল। হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনটা কমাইয়া দিতেছিলাম, চোখের উপর আলো তীক্ষ্ণ লাগিতেছিল, এমন সময় সিপাহী বার্ত্তা-বহ হইয়া পুনরায় আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। আলোটা আর কমানো হইল না।

কহিলাম—"কি আবার এলে যে ?"

—"দারোগা-বাবু পাঠিয়ে দিলেন, খুব জরুরী দরকার, একবার গেটে যেতে হবে।"

—"খুব জরুরী দরকার ?"

—"তাইতো বল্লেন।"

—"চল, যাই।" বলিয়া বালিশের তলা হইতে গেঞ্জিটা নিয়া গায়ে দিলাম। সিপাহী তালা খুলিয়া বাহির হইবার সুযোগ দিল।

বাহিরে আসিতেই নজরে পড়িল যে, আকাশ ও পৃথিবী জ্যোছনায় ছাইয়া গিয়াছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকিতে রাত্রির এ-আয়োজনের খবর মোটেই পাই নাই। লণ্ঠনের আলো বন্ধ

ঘরের অন্ধকারকে কোনমতে মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে করিতে পারিয়াছিল। আর এ-দিকে যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্যোছনার দখলে আসিয়া গিয়াছে—অন্ধকারের জীবের মত নিজের গহ্বরে থাকিয়া তা'র খোঁজ রাখি নাই। অবশ্য রাখার উপায়ও ছিল না।

দিনের আকাশই যে রাত্রে এমন হইয়াছে, এ আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। এ-আকাশের জাতই আলাদা, রূপ তো আলাদা বটেই। দিনে মাথার উপর যে-আকাশ ছিল, এখন সে-আকাশ নাই, অন্য আকাশ-আচ্ছাদন আমাদের উপর আসিয়াছে। পক্ষী-মাতা যেমন নিবিড় স্নেহে ছানাকে পাখার আড়ালে ঢাকিয়া লয়, আমাদের এই ভূমণ্ডলকেও কোন বিরাট-বিহঙ্গী আকাশ-পাখায় আড়াল করিয়াছে—তাই গভীর প্রশান্তিতে সমস্তই স্তব্ধ ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।

গেটে আসিলাম। লোহার বড় দরজার ও-পাশে বড় দারোগা-বাবু দাঁড়াইয়া।

কহিলাম—"রাত্রে যে?"

—"দরকার পড়লে রাত্র আর দিন···"

—"দরকারটা কি শুনতে পারি?"

—"Transfer-order আছে। এই মেলে আপনাকে ফরিদপুর যেতে হবে।"

শুনিয়া মন নাচিয়া উঠিল, ফরিদপুর জেলে বন্ধুরা সব জমায়েৎ হইয়াছে, কাজেই—কিন্তু মনের নাচন থামাইয়া রাখিলাম।

—"ফরিদপুরে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার তো

একটা সুবিধা অসুবিধা আছে। রাত সাড়ে-ন'টায় এসে বলবেন, চলুন এখনই যেতে হবে—এ কেমন ক'রে হয়?"

—"কি করব বলুন, আমিও অর্ডার পেয়েছি আটটার পরে। আপনি তো এস-ডি-ওকে বলেছিলেন—"

—"তা বলেছিলাম। কিন্তু বেকার-সাহেব তো বলেন নাই যে, আজই আমার যেতে হবে। বরং আমি পীড়াপীড়ি করায় শেষটা রাজী হলেন যে, দু'এক দিনের মধ্যে যা'তে আমাকে পাঠাতে পারেন চেষ্টা করবেন।"

দারোগা-বাবু বলিলেন—"আপনার তো মাল-পত্তর বিশেষ কিছু নাই, ঝাড়া হাত-পা, যেতে হাঙ্গামা কি?"

—"তা' আপনি বুঝবেন না আমি আজ যেতে পারব না।"

দারোগা সত্যই ভদ্রমানুষ, ব্যবহারে তো তাহাই মনে হইল। এমন ভাবে অনুনয় করিয়া ধরিলেন যে, শেষটা রাজী হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আজ যাইতেছি, বাসার ও এখানকার সকলকে তা' জানানো দরকার যে।

কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেই দারোগা হাসিয়া ফেলিলেন—"ভাববেন না, যাঁ'রা খবর পাবার তাঁরা পেয়েছেন। ষ্টেশনে গিয়েই দেখতে পাবেন।"

আমার কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। পুলিশের লোক সত্য কথা বলে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে—এ-অভিজ্ঞতা আমার নাই। সত্যবাদী বলিয়া পুলিশের বদনাম আছে, পুলিশের লোকেও স্বীকার পাইবে না।

মিনিট পোনেরর মধ্যেই জেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সঙ্গে দারোগা ছাড়া সিপাহী কেহ নাই দেখিয়া একটু ভাবিলাম যে, ব্যাপারটা কি। যাহাকে খুঁজিবার জন্য ইউরোপীয়ান-অফিসার পর্য্যন্ত সাত আটবার বাসায় সদল-বলে হানা দিয়াছে, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা'র ভয়ঙ্করত্ব ও মর্য্যাদা এমন অনায়াসে এত কমিয়া গেল কেন।

কিন্তু ষ্টেশনের রাস্তায় না গিয়া দারোগাবাবু যখন "ওদিকে নয়, এ রাস্তায় আসুন" বলিয়া সোজা নদীর ঘাটের দিকে মোড় ঘুরিলেন, আমি মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কহিলাম—"ষ্টেশনে যাবেন তো?"

—"হাঁ, ষ্টেশনেই তো যাচ্ছি।

—"তবে নদীর ঘাটের দিকে কেন? সোজা রাস্তা দিয়েই চলুন।"

—"রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে নিষেধ আছে।"

—"কেন?"

"—পুলিশ-পাহারায় সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তায় এখানকার লোক, একটা demonstration হতে পারে, আই-বি তা' চায় না।

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম—"ভুল করেছেন, এত রাত্রে demonstration করার মত লোক রাস্তায় পাবেন না, খামাকা ভাবছেন। চলুন হেঁটেই যাই।"

—"খামাকা পরিশ্রম করবেন কেন? বড় পানসী-নৌকা আছে, এ-জ্যোছনায় যেতে আরামও পাবেন, ভালোও লাগবে। আর আপনি তো শুনেছি কবি মানুষ।"

রাজী হইয়া গেলাম। কবি-মানুষ বলিয়া চিনিয়াছেন, অতএব কবির মর্য্যাদা রাখিতে হইবে, সে জন্যও নয়। কিম্বা প্রচ্ছন্ন-প্রশংসায় তুষ্ট হইয়াছি তাহাও নয়। এই রাত্রে নদীতে নৌকায় চড়িয়া যাইতে পারিব—মন লোভী হইয়া উঠিল। লোভকে পাপ বলা হয়, আর পাপে মৃত্যু তো অবধারিত। আমারও মৃত্যু হইল—মানে বড় দারোগা-বাবুর কাছে হার মানিলাম, আমার ইচ্ছামত রাস্তায় যাওয়ার কথাটা টিকাইয়া রাখিতে পারিলাম না।

নদীর ঘাটে আসিয়া দেখি পুলিশের বড় নৌকা, বন্দুক হাতে কয়েকজন সিপাহী দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। সিঁড়ি ফেলানোই ছিল, উঠিয়া ছাদে গিয়া বসিলাম। দারোগা-সাহেবও পাশে আসিয়া বসিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝিরা দাঁড় লইল।

সবেমাত্র চৈত্র-মাস শেষ হইয়াছে। বাতাসে গ্রীষ্মের তাপ যা' ছিল নদীর স্পর্শে তা' মুছিয়া গিয়াছে। আড়িয়ালখাঁর এ-পার ও পার জ্যোছনায় ভরিয়া গিয়াছে। কি সুন্দরই যে লাগিতে লাগিল! ভুলিয়া গেলাম যে, আমি বন্দী,আমাকে ঘিরিয়া সশস্ত্র পুলিশ-পাহারা। আমাকে বন্দী করে কে? আমার মুক্তি যে আকাশ-পৃথিবী যুড়িয়া আছে। ঐ আকাশ, ঐ সাদা পাতলা মেঘগুলি, এই নদী, তা'র ঐ তীরের ঘুমন্ত গ্রাম ও বন, দাঁড়ের আঘাতে ভাঙ্গিয়া-পড়া হাজার-টুকরা-চাঁদ-নাচান ছোট ছোট ঢেউগুলি—এরা সমস্তে মিলিয়া সহস্র হাত দিয়া যে আমাকে আমার নিকট হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, অসীমের মধ্যে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছে—এ-খবর এই এত কাছে বসিয়াও তো পুলিশের কর্ম্মচারী

জানিতে পারিল না। সে নিশ্চিন্ত হইয়াই আছে, মানুষটার শরীর যখন নিজের জিম্মাতেই আছে, তখন আর বন্দী সম্বন্ধে ভাবনা কি। কিন্তু আমি যে বন্দী নয়, আমি যে মুক্ত পলাতক—এ-সত্য জানার মত শিক্ষা বা দৃষ্টি কোনটাই তা'র নাই।

শিক্ষিত উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত ধারণা যে, মানুষের মন নিয়া মাথা ঘামাইবার দরকার করে না। জেলে আটকাইয়া রাখিয়া ভাবে, বন্দী করিয়া বেশ নির্য্যাতন করিতেছে। কিন্তু কতবড় মিথ্যা তা'দের এ-বিশ্বাস—আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিত। যতদিন আকাশ আমার চোখ হইতে না সরিবে, যতদিন দিনের-আলো আমার দৃষ্টি হইতে সরানো না হইবে, কিম্বা যতদিন ঊর্দ্ধ হইতে বৃষ্টির ধারা-পতন দেখা বন্ধ না করিতে পারিবে, অথবা দিন শেষ হইলে রাত্রে অন্ধকার নামিয়া-আসা না আটকাইতে পারিবে—ততদিন আমাকে বন্দী করার আশা দুরাশা, সে-আশা সরকারই করুক বা আমার সংসারই করুক।

দারোগা-সাহেব আলাপ-আলোচনা চালাইতে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে আলাপ করিবে, সে আমার মধ্যে বহুক্ষণ অনুপস্থিত। এই আমার আড়িয়ালখাঁ, ঐ আমার মাথার উপর আমার জন্মভূমির আকাশ, আর আকাশে চাঁদ, তা'র দিগন্ত বিস্তারিত জ্যোছনা—আমি সকলের সঙ্গে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া যখন নৌকা থামিল, তখন মনকে জোর করিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম, কহিলাম—"নামবেন না? চলুন, নীচে নামি।"

—"নীচে নামবেন ? কিন্তু পাড়ে যাবেন কি করে ?—এই মাঝি, নৌকা পাড়ে নিতে পারবে ?"

মাঝি উত্তর করিল—"হুজুর, ষ্টীমারে তো এখান থেকে উঠতেই সুবিধা হবে। এত নৌকা ঠেলে পাড়ে-নেওয়া, আবার বের করা—বিস্তর হাঙ্গামা।"

দারোগা বাবুকে কহিলাম—"নৌকার ছইয়ের উপর দিয়েই চলুন যাওয়া যাবে।"

দারোগা সাহেব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এতদূর হইতে ছইয়ে-ছইয়ে কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তারিত বটে—কিন্তু তা'তে পতনের সম্ভাবনাও তো আছে। তা' ছাড়া বয়স্ক মানুষ, সাবধান-সতর্ক হইয়া চলাফেরা করাই উচিত।

দেখিলাম, তীর হইতে কয়েকজন লোক ছইয়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া এ-দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে-দিকে দারোগা-সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলাম—"ঐ দেখুন, ওরাও আসছে। চলুন নামি, আবার ষ্টীমার এসে পড়বে।"

কিন্তু নামিবার দরকার হইল না, যাহারা নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া আসিতেছিল, তাহারা একটু অগ্রসর হইতেই পরিষ্কার জ্যোছনায় তাদের মুখ চিনিতে পারিলাম। ডাকিয়া বলিলাম—"এই, এ-দিকে।"

ভাইদের মধ্যে দু'জন ও কয়েকটি বন্ধু আমাদের নৌকার ছাদে লাফাইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোরা খবর পেলি কি ক'রে ?"

হাসিয়া একজন সোজা-ভাবেই জবাব দিল—"যা'রা খবর দেবার তা'রাই দিয়েছে।" বলিয়া দারোগা-সাহেবের দিকে আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল।

দারোগা-সাহেব সত্য কথাই তবে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "যাঁ'রা খবর পাবার তাঁ'রা পাবেনই, ভাববেন না।" আর এরা বলিল "যা'রা খবর দেবার তা'রাই দিয়েছে।" ব্যাপার মন্দ নয়। সে-দিন এ-রকম হইতে পারিত, কিন্তু আজ এ একেবারে অসম্ভব। লোক-জনকে কাছে আসিতে দেওয়া তো দূরের কথা, আমাদের যাতায়াতের পথে প্লাটফর্মে ভিন্ন দরজা খোলা হয়, বড় ষ্টেশনে গাড়ী আসিবার আগে কিছুদূরে আমাদের গাড়ী কাটিয়া রাখা হয়। আমাদের মুখ-দর্শন যা'তে না করিতে পারে, তাই আমাদিগকে দলে দলে বাংলার বাহিরে রাজপুতনার বালির দেশে নিয়া রাখা হইয়াছে।

এদিকে চরমুগরিয়া হইতে বাঁশি বাজাইয়া ষ্টীমার রওয়ানা দিয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া। বক্তব্য যাহা তাহা সারিয়া নিলাম। দারোগা-সাহেব পাশেই মহা-মৌনীর মত চুপ করিয়াই বসিয়া কাটাইলেন, তিনি যে কিছু শোনেন বা দেখেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া আবিষ্কার করা গেল না।

ষ্টীমার আসিলে আমরা উঠিয়া বসিলাম, এরা সব নীচে নামিয়া গেল।

ইণ্টার-ক্লাশের যাত্রী, ভিড়ের কোন ভয় ছিল না, তা'ছাড়া সঙ্গে পুলিশ আছে—নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলাম। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন জানিতাম, কিন্তু সরকারও যে বোঝা-বহনে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী তা' এবার জানিলাম।

প্রথম-শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলাম। উপরে উঠিয়াই থামিয়া গেলাম। রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক ভদ্রলোক নদীর শোভা ও রাত্রির রূপ দেখিতেছিলেন। ভাবে মনে হইল, তিনি তন্ময় হইয়া আছেন। লোকটীকে চিনিলাম। একবার ভাবিলাম, কাছে গিয়া কথা বলি, আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

লোকটী বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, আমরা চলিয়া গিয়াছি, তাই ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখী হইতেই মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া নিলেন। ভদ্রলোকের লজ্জা আছে দেখিতেছি।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দারোগা-সাহেবের দৃষ্টিও ভদ্রলোকের উপর গিয়া পড়িল।

ডাকিয়া কহিলেন—"মনোমোহন-বাবু যে—"

মনোমোহন-বাবু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে চিনিতেন, হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

ইচ্ছা ছিল না, তবু ভদ্রতার খাতিরেই নমস্কারটা ফিরাইয়া দিতে হইল।

মনোমোহন-বাবু থানারই একজন দারোগা, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফরিদপুর যাচ্ছেন বুঝি ?"

মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম।

—"শরীর কেমন আছে ? তেমন ভালো মনে হচ্ছে না, রোগা হয়ে গেছেন।"

—"হুঁ।"

ভদ্রলোক অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, যাইবার জন্ম ছটফট করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছল খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

—"আসি তবে, নমস্কার।"

—দাঁড়ান, কথা আছে।"

যেন একটা আশ্চর্য্য কিছু শুনিলেন এমনভাবে চোখ মেলিয়া চাহিলেন। কহিলেন—"আমার সঙ্গে?"

—"হাঁ, আপনার সঙ্গে। আপনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?"

—"হাঁ, ইন্‌স্পেক্টর-বাবুর সঙ্গে খানাতল্লাসী করতে গিয়েছিলাম। আর তখন তো আপনি সেখানে ছিলেন।"

—"তা' ছাড়া আর যান নি?"

মনোমোহন-বাবু চুপ করিয়া রহিলেন, উত্তর করিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন গিয়েছিলেন, জান্‌তে পারি কি?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম—"মাকে গিয়ে কি বলেছিলেন? কি ব'লে আপনি আমার বাক্স খুলে চিঠি-কাগজ-পত্র দেখতে চেয়েছিলেন? কি, উত্তর দিচ্ছেন না যে? আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। আপনার সঙ্গে Search-warrant ছিল যে, একবার সার্চ্চ হ'য়ে যাবার তু'দিন পরেই একা গিয়ে খানাতল্লাসী করলেন?"

মনোমোহন-বাবু এবার জবাব দিলেন—"আপনার কোন চিঠি বা কাগজ-পত্র আমি আনিনি, বিশ্বেস করবেন।"

—"তা' আমি জানি, মা আমাকে বলেছেন। কিন্তু এইভাবে

যাওয়া, কাগজ-পত্র তল্লাসী করা, আপনার কি স্বার্থ ছিল? আর আপনি গেলেনই বা কিসের জোরে?"

মনোমোহন-বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না, যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

কহিলাম—"দাঁড়ান, আপনাকে আর বেশীক্ষণ detain করাবো না। দেখুন, বীরত্ব করা আমার স্বভাব নয়। মেজাজ গরম করতে আমার ঘৃণা হয়। এ মনে রাখলে আমার কথাটার অর্থ বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে বলতে চাই—মনোমোহনবাবু, আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, আর এগুবেন না। আচ্ছা, you may go now."

মনোমোহন-বাবু নামিয়া গেলেন। তাঁর যাওয়াটা লক্ষ্য করিতে-ছিলাম। দারোগা-বাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হোয়েচে? ভদ্রলোকের 'পর আপনি এত চটেছেন কেন?"

আমার চোখে-মুখে তখন পর্য্যন্ত সহজতা ফিরিয়া আসে নাই। চলিতে চলিতে বলিলাম—"চলুন, ক্যাবিনে গিয়ে বসি, তারপর বলব।"

ক্যাবিনে আসিয়া দেখি সিপাহীরা ইতিমধ্যে বিছানা পাতিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। জামাটা খুলিয়া গেঞ্জি গায়ে বিছানায় গিয়া বসিলাম। ষ্টীমার তখনও ছাড়ে নাই।—

কিছুক্ষণ আগে মনোমোহন-বাবুর সঙ্গে কথা বলিয়া মনে যে-বিষাক্ত কালো ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা আর ছিল না। যেটুকু বা ছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাহাও মুছিয়া গেল। এমন কি একটা উদার আনন্দের ভাব মনে ধীরে ধীরে জাগিতেছিল। বাহিরে

নদী জ্যোছনায় শান্ত হইয়া আছে—দূরের ঐ পাড় জ্যোছনায় অস্পষ্ট হইয়া স্বপ্নে-দেখা ছবির মত লাগিতেছিল। আকাশের যে-দিকটা দৃষ্টির সম্মুখে ছিল, সেখানে চাঁদ দেখা যাইতেছিল না—কিন্তু সমস্ত আকাশ মার্জ্জিত, স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ একটি রূপ নিয়া নিশীথ-রাত্রি জাগিতেছিল।

দারোগা-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনোমোহন-বাবুর সঙ্গে কি হয়েছিল? এত চটলেন কেন?"

ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এ নিয়া আলোচনা করি। কথা দিয়াছি, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিতে হইল।

কহিলাম—"দেখুন, ইংরেজ-সরকার বা ইংরেজ-জাতিকে আপনারা ভালোবাসুন, আপন মনে করুন, তা'তে বলবার কিছু আমার নাই। তার নুন খান, ঋণ শোধ করতে হবে—এও বুঝতে পারি। কিন্তু বিদেশী-সরকার ও বিজাতি-প্রীতি এও সম্ভব হয়—অথচ, আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এই নিজের দেশ ও লোককে ভালোবাসা, আপন মনে করা। এ-মনোভাব নিয়েও ঝগড়া করার প্রবৃত্তি আমার নাই। কিন্তু যখন এই মনোভাব উৎকটভাবে আত্ম-প্রকাশ করে, স্বদেশ-বাসীকে পীড়ন ও তাদের ক্ষতি করতে যখন কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ আপনাদের মনে আসে না—তখন আপনাদের এই ইতর পৌরুষ আমার অসহ্য বোধ হয়। পুলিশ-কর্ম্মচারি দেশী লোক হ'য়েও যে মাঝে মাঝে খুন হয়—তার এই কারণ। যারা খুন করে, জানবেন, তা'দের সহ্য-শক্তি ও ধৈর্য্যের সীমা এই জাতীয় ব্যবহারে আপনারা শেষ করে আনেন।

"এই মনোমোহন-বাবু আমাদের ভাড়াটিয়া, একটা বাসা নিয়া

থাকেন। ইংরেজ-প্রীতি বা সরকার-প্রীতি যা'ই বলুন, তা' কত উগ্র তাঁর, তা' আমরা বহুদিন যাবতই টের পেয়ে আসছি. বাসার ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা ছিল যে, নোটিশ দিয়ে তুলে দেওয়া। কিন্তু কর্ত্তারা ভাবলেন, দারোগা মানুষ, সরকারী চাকুরে, ভাড়াটা রীতিমত পাওয়া যাচ্ছে—কাজেই ভদ্রলোক এতদিন রয়ে গেছেন। সরকারের নুনের ঋণ-শোধ করতে তিনি কেন যে এত ভয়ানকভাবে ব্যস্ত ও চিন্তিত হয়ে থাকেন, তা' সত্যি আশ্চর্য্যের বিষয়। দেশের বাড়ী আমাদের ইতিমধ্যে তিন-চারবার সার্চ্চ হয়ে গেছে, তা'তেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি। একদিন একা গিয়ে হাজির। মা তাঁকে চিনতেন। শুনলেন যে, তাঁর ছেলের বাক্স-পেঁটরা আর একবার দেখতে তিনি এসেছেন। মেয়েমানুষ, তায় বাড়ীতে সেদিন পুরুষ-ছেলে কেউ ছিল না, রাজী হ'য়ে গেলেন। সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট দরকার, সাক্ষী দরকার, এসব কথা মার মনেও এল না। ভদ্রলোক ঘণ্টাকয়েক নির্ব্বিঘ্নে কষ্ট স্বীকার ক'রে কাগজপত্র ঘেঁটে এলেন। আচ্ছা, বলতে পারেন, সরকারের আদেশ-পালন নয়, তবু এ কেন তিনি করতে গেলেন? কি প্রয়োজন ছিল তাঁর?

"শুনতে পাই ইন্‌স্পেক্টর হবার লোভ তাঁ'র, তা' তাঁর হওয়া চাই। বলতে লজ্জা করে, তবু বল্‌ছি, তাঁ'র স্ত্রীও স্বামীর এ-রোগে আক্রান্ত। স্বামীর কাজে সাহায্য করা তাঁ'র ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে। আমাদের বাসায় যখনই তিনি আসেন, সবাই ভাবিত হয়ে উঠেন। ধরাপড়ার কয়েকদিন আগের ব্যাপার—আপনাদের superintendent-সাহেব বার পাঁচেক বাসা খুঁজে গেছেন আমাকে পাবার জন্য। না পেয়ে তিনি যে ভয়ানক চটেছিলেন, তা' তিনি নিজে গোপন করার দরকার বোধ

করেন নি। তল্লাসীর যে-নমুনা দেখিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু বেশী চটেছিলেন মনোমোহন-বাবু দারোগার স্ত্রী এই ভেবে যে—লোকটাকে প্রায়ই তো বাসায় দেখতে পাই, অথচ গ্রেপ্তার করার সময়ই তাকে বাসায় পাওয়া যায় না। সাহেব যদি শেষে তা'দের আর বিশ্বাস না করেন, স্বামীর প্রমোশন হয়তো রেগে চিরদিনের জন্য বন্ধ ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু ভদ্র-মহিলা মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওৎ পেতে রইলেন। সাহেবের কাছে মিথ্যাবাদী নাম তিনি দূর করবেনই।

"সেদিন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বেলা দেড়টায় বাসায় এসেছি। মাইল কুড়ি-পঁচিশের মত হাঁটতে হয়েছিল, তা' ছাড়া গত রাত্রে ঘুমাবার সুযোগ পাইনি। স্নানটা সেরে কোনমতে কয়েক গ্রাস গিলে নিতে পারলেই ঘুম দিতে পারি। পুকুরের ঘাটে গেলাম। সিঁড়ির উপরে কাপড় গেঞ্জি ও স্যাণ্ডাল নিয়ে এক বোন ব'সে ছিল। হঠাৎ সে ব'লে উঠল, সোনাদা' এদিকে ঘুরে দাঁড়াও।

তা'র দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখলাম, অন্য এক ঘাটে একটী মেয়েলোক কাজ করবার জন্য আসছেন।

গলাজলে দাঁড়িয়ে গাত্র-মার্জ্জনায় ব্যাপৃত ছিলাম। বোনের আদেশমত ও-ঘাটের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালাম। শুনলাম—কুন্দ, এ কে?

বোন উত্তর করল—আমার দাদা।

—কে, তোমার সোনাদা'?

—না, আমার মণিদা'।

আমাকে বল্ল—তুমি তাড়াতাড়ি কর। আজ বোধ হয় তোমার কপালে ভাত নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে রে?

—দারোগার বৌ।

—ও, তাই।

ইচ্ছা হোল বৌটিকে ভালো ক'রে দেখে নেই। বোনের নিষেধ সত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, বয়স বেশী নয়, বছর ছাব্বিশ-সাতাশের রোগা ও ফর্সা একটি স্ত্রীলোক। ঘাটে তাঁ'র কি কাজ ছিল তা' তিনিই জানেন। উঠে গেলাম। সোনাদা' কিম্বা মণিদা'—এ-সন্দেহ যেটুকু ছিল, তা' মিটে গেছে। ঘরের জানালা হ'তে আমাকে দেখতে পান—নিঃসন্দেহ হবার জন্য ঘাটে আসেন এবং তা হ'য়ে ফিরে যান।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কোন ঘরে নিদ্রা যাব ভাবছিলাম। বোন বল্ল—বাসায় থাকতে পারবেনা, অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমাও।

—এখন আর যেতে ইচ্ছে করছেনা। দাঁড়াতে পর্য্যন্ত পার্চ্ছিনা।

—না, তা' হ'বে না। পুলিশ এল বলে—তুমি যাও। সোনাদা' না মনিদা' এ-প্রশ্নের পরেও তুমি থাকতে চাও? কথা শোন।

কথা শুনলাম না। আমার অবস্থা দেখে শেষে রাজী হল। পাশের বাসার ভাড়াটে ভদ্রলোক একাই আছেন, ছেলে-মেয়েরা সব দেশে, একটা খালি ঘরে বিছানা পেতে বার থেকে শিকল টেনে বোনতো চলে গেল।

এক সময়ে ধাক্কা খেয়ে জেগে দেখি, ভাই-বোনেরা কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।

—কি, ব্যাপার কি ?

—এই এতক্ষণে পুলিশ বিদায় নিল। তোমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে ফিরে গিয়ে কেবল একখানা বই হাতে নিয়েছি, দেখি জ্যাঠামহাশয়, বল্লেন—পুলিশ এসেছে, সার্চ্চ করবে। পিছনে দেখি সুপারিণ্টেনডেন্ট নিজে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দারোগা-পুলিশ।

হেসে বল্লাম—কুন্দ, দারোগার বৌকে সান্ত্বনা দিয়ে আসিস। হয়তো আশা-ভঙ্গ হওয়ায় উনিও সাহেবের ভয়ে বিছানা নিয়েছেন।

—তা' ভালো ক'রেই দিয়ে আসব।

এক ভাই থার্ড-ক্লাশে পড়ে, রাগটা তা'র অমনিই একটু বেশী, বল্ল —ওর স্পাইগিরি ছুটিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

ধমক দিয়ে বল্লাম—রাখ, বীরত্ব করতে হবেনা। যদি শুনি যে, কোন কথা বলেছিস্ বা কোন খারাপ ব্যবহার করেছিস্, তবে জানবি সেদিন থেকে তোদের মুখ দেখা আমি বন্ধ করব।

বোন বল্ল—তুমি ইচ্ছে হয় মুখ দেখা বন্ধ করতে পার। কিন্তু আমি কয়েকটি কথা না ব'লে পারবনা ব'লে রাখলাম।

ওদের শান্ত করতে আমার বেশী বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু যে-ঘৃণা আমার মনে জন্মেছে তা' থেকে আমি আজও রেহাই পাইনি। তা'তো কিছুক্ষণ আগেই দেখলেন।"

একটু থামিয়া কহিলাম—"সত্যি, আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগে, এ কেমন ক'রে হয়। মেয়ে-মানুষ, স্নেহ-ভালবাসা যেখানে স্বভাবতই বেশী থাকে, সেখানেও এ-রকম হয়—বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, দুঃখও হয়।"

দারোগা-সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। জামাটা তুলিয়া পকেট

হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া দেখি, তা' খালি, সিগারেট নাই।

দারোগা-সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"নিয়ে আসছি। 'গোল্ড-ফ্লেক' তো?"

—"আপনি কেন যাচ্ছেন? ওদের দিন, এনে দেবে।"

—"তা'তে কি। যাই, নিয়ে আসি। পান খান তো?"

পান-খাওয়ার অভ্যাস নাই শুনিয়া অবাক হইলেন। সিগারেট চলে অথচ পান খাইনা, হিসাব-মিলানো বোধ হয় দারোগা-সাহেবের কষ্টকর ঠেকিতেছিল।

ষ্টীমার বাঁশী বাজাইয়া ষ্টেশন ছাড়িল, কিছুক্ষণ পরে দারোগা-সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

সিগারেট ও দেশলাই হাতে লইয়া বলিলাম—"ম্যাচ আমার সঙ্গেই ছিল, আবার আনলেন কেন? রেখে দিন।"

দারোগা-পত্নীর কাহিনী বলিতে গিয়া মনে আবার কালো ছায়া নামিয়াছিল। সিগারেট মুখে লইয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। খদ্দরের চাদরটায় কোমর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া লইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। ক্ষণপূর্ব্বে মনে যে উদার আনন্দ ধরা দিয়াছিল, তা'র প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম। আমি যেন একা বাসর জাগিতেছি, মনের পাশে আসিয়া যে বসিবে তা'কে শান্ত আকাশ ও নদীর কোথাও দেখিতে পাই কিনা, চোখ মেলিয়া রহিলাম। এক সময়ে ঘুম আসিল কিন্তু সে-শান্তি আসিল না। —ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিতেই ইলেকট্রিকের

কড়া আলো চোখের উপর আসিয়া পড়িল—যেন কার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। চোখ কয়েকবার বুজিয়া-মেলিয়া আলোটা সহাইয়া লইলাম। দেখিলাম সবুজ রংয়ের ছোট ছোট অসংখ্য পোকা আলোটাকে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে। উজ্জ্বল আলো অন্ধকার হইতে অসংখ্য পতঙ্গকে টানিয়া আনিয়াছে। কাচের আবরণ না থাকিলে আলোক-পিপাসী এই সংখ্যাহীন পতঙ্গের দল বহুপূর্ব্বেই জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইত।

পায়ের কাছে দারোগা-সাহেব মুড়িশুড়ি দিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। নীচে মেঝেতে সিপাহী কয়জনও ঘুমে অচৈতন্য—পাশেই বন্দুক কয়টা তা'দেরই মত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। তাদের শিওরের কাছে এক ভদ্রলোক-যাত্রী বেঞ্চে স্থানাভাব দেখিয়া নীচে শতরঞ্চি বিছাইয়া জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন, তিনিও নিদ্রিত। নদীর বাতাস ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। উঠিয়া চাদরটা গায়ে দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বাহির হইলাম।

বাহির হইয়া দেখিলাম—ঘুমন্তপুরী। নীচে ষ্টীমারের হৃদ্-স্পন্দন ছাড়া কোথাও প্রাণের সাড়া-শব্দ নাই। পোটলা-পুটলী বাক্স-পেটরা ইত্যাদি নিয়া সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগিলে এই মানুষগুলিই বিভিন্ন চরিত্র নিয়া সংসারে চড়িয়া বেড়ায়, এখন সমস্ত আশা-আকাঙ্খা গুটাইয়া লইয়া মড়ার মত পড়িয়া আছে। একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ ও ব্যবধান বুঝিবার উপায় নাই। চরিত্রহীন লম্পট আর সংযত সাধুচরিত্র ব্যক্তি, কে ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করিতে পারে, সব সমান হইয়া গেছে।—

ঘুমন্ত মানুষ সত্যই অদ্ভুত লাগে। মনে যেন কেমনতর একটা ভাব হয়, এদের অপরিচিত বোধ হয়। একটু ভয়-ভয় ভাবও থাকে।

এখন রাত্র প্রায় দেড়টার মত হইবে, প্রসিডেন্সি-জেলের বন্দীরা সবাই ঘুমাইয়া আছে। পাশের সীটে যে-ভদ্রলোক ছিলেন, জ্বর হওয়ায় আজ বিকালে তাঁ'কে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ আগে প্রস্রাবের ঘরে গিয়াছিলাম। করাইডর দিয়া স্যাণ্ডালে শব্দ না হয় এমনভাবে সন্তর্পণে গিয়াছি ও আসিয়াছি। সমস্ত জুড়িয়া ঘুমের এমন একটি আচ্ছাদন ছিল যে, আমার সামান্য নিঃশ্বাসেও যেন তা' দুলিতে পারে। দুই ধারে সারি সারি ঘুম খাটে পড়িয়া আছে, আমিই একমাত্র জাগ্রত-চেতনা মধ্য দিয়া পথ করিয়া হাটিয়া গিয়াছি। করাইডরের আলোতে পর্দ্দার ঘরের মধ্যে বন্ধুদের যে-ছবি দেখিয়াছি, তা'তে এরাই যে দিনের বেলার লোকজন তা' বিশ্বাস করিতে কষ্টকর হইতেছে।

ঘুমন্ত মানুষ আমার কাছে সত্যই রহস্যের মত লাগে। এমন সব প্রশ্ন মনে আসে যা দিনের আলোতে সচরাচর আসে না। বাহিরে লণ্ঠন হাতে পুকুর-পাড়ের রাস্তায় সীপাহী ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়া দিতেছে, তা'কেও এখন অলৌকিক জগতের জীব বলিয়া মনে হয়। একে রাত্র গভীর এবং ভয়ানক অন্ধকার, তায় আবার চারিপাশে পুঞ্জীভূত নিদ্রা বিস্তৃত হইয়া আছে। মনকে কোন অদৃশ্য অন্ধকারের দিকে কে যেন টানিয়া নিতে চায়। কিন্তু রাত্রিবেলার এ অচেনা প্রশ্নকে অনুসরণ করিয়া অজানা অপার অন্ধকারে গিয়া প্রবেশ করিতে ভয় লাগিতেছে। মনকে ঝাঁকানি দিয়া আবার সাত বছর আগের রাত্রিতে নিয়া যাই—ষ্টীমারের হৃদ্-স্পন্দন, পাখায় জল-কাটার শব্দ মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বর্ত্তমানের এই বাস্তবতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লই।—

সিগারেটটা প্রায় অর্দ্ধেক জ্বলিয়া মাথায় ছাই জমিয়া আছে—টোকা দিয়া ঝাড়িয়া ফেলি। পাশেই মেয়েদের ইণ্টার-কেবিন, নীচে যাইবার সময় চোখে পড়িল সেখানেও ঘুম। একটা শিশু মায়ের স্তনে মুখ রাখিয়া ঘুমাইতেছে—মায়ের হাতটা ছেলেটাকে ঘুমের মধ্যেও বেষ্টন করিয়া বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছিল। ছবিটি চোখের উপর লইয়া সিঁড়ির মাথায় আসিলাম।

নীচে নামিতে গিয়া দেখিলাম, ও-পাশে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। ঠাহর করিয়া দেখিলাম—বুড়ামানুষ, হাতে একটা থলি, বোধ হয় মালা জপিতেছে। এই একটি মাত্র মানুষকে জাগা দেখিলাম। সবাই যখন ঘুমাইতেছে, তখন এ জাগিয়া বসিয়া নাম জপিতেছে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ-শ্রম সফল বা পণ্ড-শ্রম ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উঠিল না। যে বিশ্বাস করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তা'কে মনে-মনেও বিচারের বস্তু করিয়া কৃপা দেখাইবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

নীচে আসিয়া ষ্টীমারের কল-ঘরের সামনে রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। একটা চাকার সামনে টুল পাতিয়া একজন খালাসী তামাক টানিতেছিল। দরকার মত উঠিয়া চাকা দুই হাতে ঘুরাইয়া গতি মন্থর বা দ্রুত করিতে হইবে, তাই জাগিয়া বসিয়া আছে। ষ্টীমারের প্রকাণ্ড পিষ্টন কয়টা কেবল উঠিতেছে আর পড়িতেছে প্রচণ্ড শক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত। বয়লারের মুখের ঢাকনী খুলিতেই ভিতরের আগুনের আলোয় নীচের সবটা পরিষ্কার দেখা গেল। একজন খালাসী মাথায় কালো একটা রুমাল জড়াইয়া ষ্টীমারের বিরাট অগ্নিগর্ভ-উদরে কয়লা ঠেলিয়া দিল, বড় একটা

লৌহ অস্ত্র দিয়া ভিতরটা বেশ খুঁচিয়া দিয়া তারপর দরজা বন্ধ করিল।

এখন কে বুঝিবে প্রচণ্ড আগুন ভিতরে জ্বলিতেছে—বাহির হইতে সামান্য তাপ ছাড়া আর কিছু বুঝিবার যো নাই। এই আগুন আর জলে মিলিয়া এই বিরাট কাণ্ড চালাইয়া যাইতেছে। মানুষের বুদ্ধি হু'টি অন্ধ-শক্তিকে এমন সম্পর্কে ও এমন প্রণালীতে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছে যে, এতবড় একটা ষ্টীমারকে তা' অনায়াসে জল ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছে। শক্তিকে যদি বুদ্ধিতে সংযত করা যায় তবেই এই রকম অত্যাশ্চর্য্য কাজ পাওয়া যায়—কথাটা মনে সত্যের মত ধাক্কা দিল।

অনেকক্ষণ হয় নীচে নামিয়াছিলাম। আবার উপরে উঠিয়া গেলাম। সিঁড়ীর ওধারে লোকটি তেমনি বসিয়া আছে। মেয়েদের ক্যাবিনেও ঘুমে সবাই অচৈতন্য। এদিকের যাত্রিরাও কেহ জাগ্রত বলিয়া মনে হইল না।

ক্যাবিনে ঢুকিতেই দেখি এক সিপাহী উঠিয়া বসিয়া আছে। বুঝিলাম, জাগিয়া আমাকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তা'দের নিদ্রিত দেখিয়া কোন ষ্টেশনে নামিয়া পলায়ন করিয়াছি কিনা এবং এজন্য দারোগো-বাবুকে জানানো উচিৎ কিনা বেচারার ইত্যাদি চিন্তার মাঝখানে মূর্ত্তিমান মীমাংসার মতই আমি গিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিল—" কোথায় গিয়েছিলেন ? " স্বরে নিষ্কৃতি-বোধের আভাস

—"নীচে।"

—"প্রস্রাব করতে বুঝি ?"

—"হঁ্যা।"

—"আমিও একটু নীচে ঘুরে আসি"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আমি আবার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিলাম, তখন দেখি ষ্টীমার পদ্মা-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। দূরে নদীর পূব-পারে গ্রামের গাছের মাথায় আকাশে লাল-রংয়ের ছোপ লাগিয়াছে। অন্ধকার ঠেলিয়া যে প্রকাণ্ড বহ্নি-পিণ্ড আসিতেছে, আকাশ-মুখে ঐ তার পূর্ব্বাভাস। শুকতারাকে দেখিবার জন্য চারিদিক তাকাইলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। পদ্মার উপর প্রশান্ত প্রভাত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই চোক মেলিয়া রাখিলাম—মনের আকাশে কি এমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় কোন সত্তা প্রকাশিত হইতে পারে না, যার আলোতে দৃষ্টি সর্ব্বত্র মুক্তি পায় এবং যে-আলো কখনও নিষ্প্রভ বা অস্তমিত হয় না ?

** ** **

আমাকে ফরিদপুর-জেলের অফিসের জিম্মা করিয়া দিয়া দারোগা-সাহেব বিদায় নিয়াছেন প্রায় আধঘণ্টা হয়। যাইবার সময় নমস্কার করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে, পথে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁ'র ব্যবহারে হইয়া থাকে তা' যেন মনে না রাখি। আমিও নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া কথা দিয়াছি যে, তা' মনে রাখিব না।

এ দিকে রাত্র প্রায় সাড়ে দশটা, অফিসে আর কত বসিয়া থাকিব, ভিতরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলাম।

জমাদার ও সিপাহী ছাড়া একটি মাত্র লোক অফিসে চেয়ারের উপর পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া খাতা লিখিতেছিলেন। পদ-মর্য্যাদা যে তাঁ'র খুব বেশী তা' আমার মনে হয় নাই।

তবু কহিলাম—"আমার ভিতরে যাবার বন্দোবস্ত করে দিন, আর কতক্ষণ ব'সে থাকব?"

অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটাকে আবার জ্বালাইয়া লইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

—"সে কথা কতবার জিজ্ঞেস করবেন? খাওয়া-দাওয়া আমার হয়ে গেছে, সে-জন্য ভাববেন না। এখন ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।"

—"বসুন না, যাবেনই তো। ততক্ষণ একটু গল্প করা যাক!"

গল্প করিবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না, তাহা জানাইয়া দিতে তিনি জমাদারকে কহিলেন—"বাবুকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

জমাদার কি একটা প্রশ্ন তুলিল বুঝিলাম না। শুধু কানে আসিল সেলে নিয়া যাইবার কথা।

কহিলাম—"আর যাঁ'রা আছেন, তাঁ'রা কোথায় থাকেন, সেইখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।"

—"সে আমি পারব না, জেলার বাবু আসুন।"

—"তিনি কখন আসবেন?"

—"ঠিক নেই। নাও আসতে পারেন।"

—"তিনি যদি না আসেন, তবে কি সারারাত এখানে বসে কাটাব?"

—"না, এগারোটা অবধি দেখব, তারপর আজ রাত্রের মত

একটা সেলে পাঠিয়ে দেব। ভোরে জেলারবাবু, সুপার এদের সঙ্গে কোথায় থাকবেন ঠিক করে নেবেন।"

উঞ্চ হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় রোগা পাতলা একটী ভদ্রলোক ঢুকিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, ব্যাপার কি ?"

ভদ্রলোক একটু তোতলা। পরিচয় পাইলাম যে ইনিই ডেপুটি-জেলার। ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে তিনিও আমাকে বলিলেন—"আজ সেলেই চলুন, কাল ভোরে সব ঠিক করে দেওয়া যাবে।"

আমি আমার আপত্তি জানাইলাম। ভদ্রলোক কহিলেন—"যখন ছাড়বেন না, তখন চলুন। কি আর করা যায়।"

জেলের ভিতরে ঢুকিলাম, সঙ্গে ডেপুটী-জেলার ও এক জমাদার। অবশেষে একটা ওয়ার্ডে ঢুকিয়া ডেপুটি-বাবু বড় বারান্দা-আলা এক ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিলেন।

ডাকিয়া কহিলেন—"পঞ্চানন-বাবু, ঘুমুলেন নাকি ?"

—"না, কেন ?"

—"আরে মশায় উঠুন। দেখুন, কি এনেছি।"

ভিতরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ পাইলাম এবং দরজার সামনে যে অনেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিলাম।

ভিতর হইতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"কি এনেছেন ?"

—"তা' বলব না, খুলেই দেখুন।"

তালা খুলিয়া দিবার তর তা'দের সহিতেছিল না। দরজা খুলিতেই ডেপুটি-জেলার বলিলেন—"নিন, আপনাদের জিনিষ আপনারা নিন।"

অনেকগুলি হাত প্রসারিত হইয়া পড়িল। সে কী চীৎকার আর হল্লা—যেন মদ খাইয়া মাতলামী সুরু হইয়াছে।

উপেন-বাবু (দাস) হুলু-ধ্বনি দিয়া বরণ করিয়া নিলেন। এবং মেয়েরা যেমন জামাই-বরণ করে, তেমনি হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গান ধরিলেন—"এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—"

যতীনদা' (ভট্টাচার্য্য) মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

টেনা-বাবু বলিলেন—"ডেপুটির গলা শুনেই বুঝতে পারলাম যে তুই।"

ফণী মজুমদার বলিল—"ভাইডী আইছস্, ভাল করছস্।"

অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার বেগ একটু প্রশমিত হইলে আমাকে ঘিরিয়া লইয়া সবাই বসিলেন। ইহারা আটজন অষ্ট-বজ্র হইয়া এতদিন ছিলেন, এখন আমি আসিয়া পড়ায় আট হইল নয় এবং সব মিলিয়া হইল নব-রত্নের সভা।

বুড়া বয়সে মানুষ পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া যখন দেখে, তখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-জীবনটাই জীবনে সব চাইতে সুখের ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। হয়ত এমন অসম্ভব আশাও করে যে, আর একবার যদি সে-দিনগুলি ফিরিয়া পাওয়া যাইত তবে জীবন এবার এমন করিয়া সুরু করিত যে, ভুল-চুকগুলি ঘটিতে দিত না—যে-সব ভুলের জন্য জীবন মনের মত হইতে পারে নাই। বন্দি-জীবনে এই দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়া আসিয়া আজ আমার মনে হইতেছে যে, ফরিদপুর-জেলের দিনগুলিই আমার জেল-জীবনের সুখের ও শ্রেষ্ঠ দিন গিয়াছে।

একতলা একটি বিলডিং-এ আমরা নয়জন থাকিতাম। দক্ষিণ-মুখী ঘর, খোলা লম্বা টানা-বারান্দা। রেলিং-এর ও-ধারে জেলের পুকুর। তার পাড় ঘেঁষিয়া দক্ষিণে জেলের প্রাচীর। দেয়ালের ও-ধারেই সহরের রাজ-পথ, রাস্তার দক্ষিণে খেলার মাঠ—তারপর ফরিদপুর কলেজের বাড়ী। বারান্দায় বসিয়া কলেজের বাড়ীর চূড়া দেখা যাইত—তারপরেই দৃষ্টি আকাশের সীমায় শেষ হইত।

আমাদের বিল্‌ডিংটীকে বাংলো-বাড়ীর মত মনে হইত। জেলখানায় এটী যেন কোন সৌখীন ধনীর স্বাস্থ্যনিবাস—সামনে একটু বাগান ও পরে পুকুরটী থাকায় এটি ঐরূপই দেখাইত। বর্ষাকালে পুকুরের জল কানায় কানায় ভরিয়া যায়। একদিন রাত্রে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ নজরে পড়িল যে, আমাদের ঘরটীর ছায়া পুকুরের জলে পড়িয়াছে, ছায়ার আলোগুলি জলে ঝিকি-মিকি করিতেছে। সেদিন হইতে ঘরটীকে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম।

গ্রীষ্ম চলিয়া গেলে যখন বর্ষা আসিল, তখন সেই বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চোখের ও মনের তৃপ্তি মিটাইতাম। কত সন্ধ্যা ও রাত্রের প্রথম অংশ এইভাবে বসিয়া বর্ষার উৎসব দেখিয়াছি—এতদূর হইতে এখন তা' স্বপ্নের মত মনে হয়। এমন যে কুৎসিত ব্যাং, তা'র কর্কশ গম্ভীর স্বর পর্য্যন্ত কান পাতিয়া শুনিতাম—বর্ষার অন্তর্নিহিত সুরের গাম্ভীর্য্য তা'রা আরও সঘন :করিয়া তুলিত। আকাশ হইতে অবিরল জল-ধারা নামিতেছে। চারিদিক দিনের বেলাতেই ছায়া-অন্ধকারে আবৃত, আকাশে যতদূর দৃষ্টি যায় মেঘে-মেঘে সঘন হইয়া আছে; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়া যাইতেছে—এ সমস্ত মিলিয়া বর্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিত না যদি ব্যাংয়ের

সেই একটানা গম্ভীর ধ্বনিটী না থাকিত। কেকা-ধ্বনিতে নয়, মেঘ গর্জ্জনে নয়, কুটজ-কুসুমেও নয়—ব্যাংয়ের ডাকেই বর্ষার নিজস্ব স্বর ও রূপ অভিব্যক্ত হইতে পারে। অন্ধকারে জেলের নর্দ্দমায়, পুকুরের পাড়ে ব্যাং ডাকিত, রিম্‌ঝিম্ অবিরল পানি-বরিষণ—শুনিতে শুনিতে যে কতরাত্রি জাগিয়াছি, ভাবিলে হাসি পায় না, ছেলে-মানুষী মনে হয় না, বরং মন তৃষার্ত্ত হইয়া উঠে সে-বর্ষারাত্রিগুলির জন্য। মনে করিতে আজও জলে-ভেজা বিহগীর মত একটুখানি ছোট ভীরু-সুখ বুকের নীচে ডানা নাড়া দিয়া উঠে, শেষ জল-ফোঁটা ঝারিয়া ফেলিতে চঞ্চল হয়।

বর্ষা-রাত্রের একদিনের ছোট একটু ঘটনা মনে আসিয়াছে।—

সে-দিন রাত্রে গুরু-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আমের কাল গিয়াছে, কিন্তু দাম দিলে তখনও মিলিত। তদুপরি স্বর্ণ-বর্ণ বৃহৎ কদলীও সংগৃহীত ছিল। যে-সব বড় বড় ইলিশ-মৎস্য পদ্মার গভীর জলে বসবাস করে, তাহাদের কতিপয়কে ধীবরেরা জালে আটকাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছিল ; জলতল-বাসী বৃহদায়তন বন্দীদের কয়েকটি এই জেলখানার বন্দীদের রান্নাঘরে আনীত হইয়াছিল। আমরা নিরামিষ-ভোজী ছিলাম না, মাংসেও আমাদের রুচি ছিল, তাই খাদ্যতালিকায় তাহাও পড়িয়াছিল। দিনের বেলাতেই সূচনা দেখিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, রাত্রে বর্ষণটা একটু মুষল-ধারেই হইবে। সর্ব্বোপরি, জেলখানায় আবদ্ধ থাকায় কারু মনে কোন সুখ ছিল না। সেই জন্যই সব দিক ভাবিয়া গুরু-ভোজনেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রাত্রের ভোজনের জন্য বিকাল হইতেই দেখিলাম সবাই প্রস্তুত

হইতেছেন। যতীনদা' পর্য্যন্ত জেল-গেট হইতে ঘানিঘর পর্য্যন্ত লাল-সুরকীর রাস্তা দ্রুত-বেগে ভ্রমণ করিতেছেন, সঙ্গে মাষ্টার মশায় অশ্বিনী-দাস—গেঞ্জিটা ঘামে ভিজিয়া টুপটাপ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবেন না, উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন।

একটু অধিক রাত্রে আমরা আসনে গিয়া বসিলাম। আমাদের কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্য যে কয়েকজন কয়েদী পাইয়াছিলাম, তা'র মধ্যে তিনজন আমাদের ঘরেই থাকিত, বাকী ক'জন ভোর হইলে 'নম্বর' হইতে এখানে আসিত আর সন্ধ্যায় বন্ধ হইবার জন্য চলিয়া যাইত। জেলারের সঙ্গে কথা ছিল যে, তা'রা রাত দশটায় যাইবে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তা'রা তৈরী হইয়া ছিল—জমাদার আসিয়া তা'দের লইয়া গিয়াছে। নেপাল, কাঙ্গালী ও সদানন্দ এই তিন জন পরিবেশনে লাগিল।

ভোজনের বর্ণনা করিব না, কারণ সে বর্ণনার বস্তু নয়—চোখে দেখিবার জিনিষ। মানুষ যে এমন মরণ-পণ করিয়া খাইতে পারে, আগে বিশ্বাস করি নাই। এখন দেখিলাম, এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান কত স্বল্প। সেদিন প্রত্যয় হইল যে, মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

শেষের দিকে সবাই যখন ক্লান্ত হইয়া অ'স্যি'ছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ফণী, আর কিছু লাগবে ?"

—"লাগবে।"

যতীনদা' চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, ফণীর আহারের পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। চোখের উপর এইরকম আত্মঘাতী চেষ্টা দেখিয়া উদ্বেগ চাপিয়া রাখা

সত্যই কষ্টকর। আশ্চর্য্য হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লাগবে ?"

সুরটা আমাদের কানে যে ভাবে ঠেকিল, তা'তে প্রশ্নটার অর্থ হয় যে, থাক আর লাগিয়া দরকার নাই, যথেষ্টের চেয়ে বেশী অনেক আগেই হইয়াছে, আর না।

ফণী ঘাড় না তুলিয়াই জবাব দিল—"একটু সময় লাগবে।"

যতীনদা' আশ্বস্ত হইয়া দম মুক্ত করিলেন, বুঝা গেল সময় দিতে তাঁ'র আপত্তি নাই। যা মাল বোঝাই হইয়াছে তা'র ঠেলা সামলাইতে পারিবে কি না, ফণী সম্বন্ধে এ-আশঙ্কা যতীনদা মনে মনে রাখিলেন না, প্রকাশ্যেই বলিয়া ফেলিলেন।

ফণী এক সময়ে মাথা তুলিয়া কহিল—"আমরা পশুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছি।"

টেনা কহিল—"না পিছনে নয়, সমান সমান আছিস্"

সব কথা কানে তোলা ফণীর স্বভাব নয়। তা' ছাড়া মন এখন তা'র দুঃখে-ভরা।

কহিল—"গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া সারাদিন মাঠে থেকে ঠেসে ঘাস খেয়ে আসে, ঘরে এসে সারা রাত তার চিবুনি চলে। উট থলি ভ'রে জল রাখে, ঠেকামত কাজ চালায়। আর আমরা—গলার নীচে মাল ঠেলে দিয়েই খালাস। শুনতেই মানুষ—আসলে পশুদেরই সুবিধে বেশী।"

দেখিলাম, এ-বিষয়ে ফণীর সঙ্গে প্রায় সকলেই একমত।

উপেন-দাস বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলেন—"কিন্তু সাপ-ব্যাং এরা তো ছ'মাস না খেয়ে থাকে।"

কথা শেষ করিতে অবসর তা'কে দেওয়া হইল না।

—"তা' হলেও নয় বুঝতাম যে, এদিক দিয়ে না হোক অন্য দিক দিয়ে আছি। ছ'মাসের খাবার হাঙ্গামা থেকে বাঁচা যেত—সেও তো একটা লাভ হোত।" বলিয়া ফণী আহারে মনোনিবেশ করিল।

মাষ্টার-মহাশয় কহিলেন—"দেখতো নেপাল, দু'একটা ঠ্যাং পাও কিনা।"

ফণী খাইতে খাইতেই কহিল—"কি, ঠ্যাং? উহুঁ, মুরগীতে ঠ্যাং থাকে না, জানেন না বুঝি? বিশ্বাস না হয় টেনাকে আর উপেনকে জিজ্ঞাসা করুন।"

যতীনদা' জাগিয়া উঠিলেন—"ও তাই ব-লো। দু'জন তো রান্নাঘরেই সারা সময় ছিল। কাজ এগিয়ে রেখেছে দেখছি।"

উপেন-দাস পঞ্চানন-বাবুর দিকে আড়-চোখে চাহিতেই যতীনদা' কহিলেন—"ও, তুমিও ছিলে বুঝি?"

ফণী চাপা-আক্রোশে কহিল—"না, উনি থাকবেন কেন, থাকব আমি। রান্নাটা পর্য্যন্ত শেষ করবার তর সয়নি। পেয়েছেন যে এই যথেষ্ট, আবার ঠ্যাংও"—বলিয়া মাষ্টার-মহাশয়কে সান্ত্বনা দিল।

পঞ্চানন-বাবু চোখে-মুখে নির্দোষীর ছবি আঁকিয়া লইয়া কহিলেন —"বাঃ রে, আমি কি করব। ডেকে নিয়ে গেল যে—"

—"তা ঠিক, তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। ডেকে নিয়ে গেলে কি আর করবে। সত্যই তো, বিপদে পড়লে কিইবা করার থাকে।"

বাইরে বৃষ্টির জোর উত্তরোত্তর বেশ বাড়িতেছিল। আকাশে যে কত জল আছে, আজ ঢালিয়া বুঝাইয়া ছাড়িতেছে।

নেপাল টেনা-বাবুকে কহিল—"বাবু যে কিছুই খালেন না। আর একটু মাংস দেই—কেমন ?"

টেনা-বাবু কহিলেন—"নারে, আর জায়গা নেই।"

ফণী কহিল—"এতক্ষণ যে ছিল, এই আশ্চর্য্য।"

ন্যায়তঃ অঙ্ক-শাস্ত্রানুযায়ী যে-কয়খানা ঠ্যাং তা'র প্রাপ্য হইত, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় ফণীর ক্ষোভ যে কত গভীর ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

ভোজন-পর্ব্ব প্রায় শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সব যোদ্ধাই রীতিমত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন উঠিয়া বিছানায় গিয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচেন।

তখন ক্ষিতীশ-বাবু (চক্রবর্ত্তী) কহিলেন—"নেপাল, আছে তো ?"

—"আছে বাবু।"

বুঝিতে না পারিয়া আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। নেপাল বড় একটা বাটী দুধে ভরিয়া আনিয়া ক্ষিতীশ-বাবুর সম্মুখে ধরিয়া দিল। সকলেই রীতিমত আঁৎকাইয়া উঠিলেন—লোকটা খেপিল নাকি, নইলে এ আত্মহত্যার সাহস কেন করিতেছে ?

টেনা-বাবু কহিলেন—"মাংসের পরে দুধ খাবেন ?"

ক্ষিতীশ-বাবু জানাইলেন যে, সেইরূপই তাহার অভিপ্রায়। ক্ষিতীশ-বাবু শৈশবেই মা ও বাবা দু'জনকে হারান, তখন তাঁ'র বয়স দিন কয়েক মাত্র। থাকার মধ্যে ঠাকুরদাদা ছিলেন। বয়স বাড়িলে পৌত্রের গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া পিতামহ অতিষ্ঠ হইয়া প্রায়ই মন্তব্য করিতেন যে, কুঁড়ে গরু খইল খাবার যম। খইল-

ভক্ষণে ক্ষিতীশবাবু সত্যই যম-সদৃশ কিনা, দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। কিন্তু দুধে ও কদলীতে তাঁ'র আসক্তি ও রুচি সত্যই অদ্ভুত ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া আজ রাত্রের আহারেও দুধ-খাওয়া—আমাদের যেন একটু বিশেষ বাড়াবাড়ি মনে হইল।

দুধে ডুবাইয়া ক্ষিতীশ-বাবু সবেমাত্র আঙুল কয়টি উপরে তুলিয়াছেন, ফণী আবিষ্কার করিল—"এ্যাঁ, দুধ কোথায়? এ যে দেখছি ক্ষীর।"

ক্ষিতীশবাবু কহিলেন—"খাবেন? নিননা।"

—"আবার দুধ খাব? দিন, অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন।"—বলিয়া ফণী একটা বাটী আগাইয়া দিল।

কদলী কয়টী আয়তনে যেমন বৃহৎ ছিল, রংয়ে তেমনি মনোহর ছিল। দেখিয়া লোভ হয় বটে, কিন্তু গ্রহণ করিবার সাহস বা অবস্থা কোনটাই আমাদের ছিল না। ফণী ও ক্ষিতীশ-বাবু তাহা নিয়া লড়িতে লাগিলেন—আমরা দ্রষ্টা হইয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলাম।

ক্ষিতীশ-বাবু অবশিষ্ট কদলীগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছোটখাটো একটী বক্তৃতা করিলেন। তা'র সারমর্ম ছিল—কোন্ গৃহস্থ-বাড়ীর ঘরের কোণে কোন্ কদলী-বৃক্ষে ইহারা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। কত বৃষ্টিতে ভিজিয়া এ রস-পুষ্ট হইয়াছে, রৌদ্রে পুড়িয়া পরিপক্ক হইয়া সোনার রং পাইয়াছে এবং ভিতরের রস দানা বাঁধিয়া মিষ্টি হইয়াছে—ভাবুন দেখি। বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলি দিনরাত লোলুপ দৃষ্টি নিয়া একে চোখে-চোখে রাখিয়া পাহারা দিয়াছে। কিন্তু একদিন নিষ্ঠুর গৃহস্থ একে ধারালো

অস্ত্রে কাটিয়া লইয়া সহরের বাজারে বিক্রয় করিয়া গেল, তারপরের ইতিহাস তো আপনাদের সম্মুখেই বর্ত্তমান। হায় সুন্দরী রম্ভা, কোন নিভৃত পল্লীর ততোধিক নিভৃত গৃহ-প্রাঙ্গণের একধারে তুমি ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলে, আর আজ লোভীর লোভ তোমাকে তোমার আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া আনিয়া কোথায় কোন পরিণতি ও সর্ব্বনাশের মধ্যে ফেলিয়া গেল।

আমরা 'হিয়ার-হিয়ার' বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। ফনী উঠিতে উঠিত কহিল—"নেপাল, ওধারের জানালাটা দয়া ক'রে খোলা রেখেচ তো, যা'তে বৃষ্টির জল বিছানা-পত্তর সব ধুইয়ে দিতে পারে?"

—"না বাবু, খোলা রাখব কেন? বৃষ্টি আসতেই বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

জেল-গেটের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই—বিছানায় শুইয়া তার ধারাপতন-শব্দ শুনিতেছিলাম। চোখে ঘুম ছিল না। আকাশে মেঘে মেঘে ধাক্কা লাগিয়া গুরুগুরু-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ আকাশে চমক দিতেছে, তা'র আলো বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে আসিয়া অন্ধকারকে পলকের জন্য ফ্যাকাশে করিয়া দিয়া যাইতেছিল। ব্যাংয়ের ডাকেরও ক্লান্তি ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া উৎসাহ তা'দের বাড়িয়াছিল, জানালার ওধারে ঘাসের উপর আসিয়াই বর্ষায় এ-গায়ককুল জমায়েৎ হইয়াছে বুঝিলাম।

"এক দুই তিন···আসামী জানালা-বাতি ঠিক আছে—আট নম্বর।" অর্থাৎ ঘোষণা করা হইতেছে যে, আট-নম্বরের এতজন

কয়েদী ঠিক আছে ; বাতিও ঠিক আছে—কোন অগ্নিকাণ্ড বা অপকর্ম্ম ঘটে নাই এবং জানালাও তেমনি ঠিক আছে, ভাঙ্গিয়া কেহ পলায়ন করে নাই। ঘুমের মধ্যেই কয়েদীদের সর্দ্দার সমস্ত গণিয়া ও দেখিয়া লইবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, তাই সতর্ক ও হুঁসিয়ার-শব্দ নিয়মিত হাঁকিয়া লইতে কোন বাধা করিতেছে না। কান পাতিয়া ঐ টানিয়া-টানিয়া ও চেঁচাইয়া-বলা গণনা শুনি। পাশের লোহার খাটে মশারি ফেলিয়া উপেন-বাবু ঘুমাইতেছেন, জোয়ার-ভাঁটার মত তাঁর নাসিকা-গর্জ্জন বাতাসে দোল খাইতেছে। ভয় হইল, এই নাসিকা-ধ্বনিতে বাহিরের ভেককুল ঘরের মধ্যে আত্মীয়ের সন্ধানে না আসিয়া পড়ে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক ঝলক আলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরের অন্ধকারের বুকে যেন বর্শা বিদ্ধ করিয়াছে, তাই রক্ত-ধারার মত আলোক পিচকারীর বেগে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য মাত্র—কারণ, পলকেই অন্ধকারের ক্ষত-মুখ বন্ধ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বাজ-পড়ার মত শব্দ, লোহার খাটটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।

পাশ ফিরিয়া ভালো করিয়া চাদরে গা মুড়িয়া লইয়া ঘুমের চেষ্টা করিলাম।

এরা সবাই তো বেশ ঘুমাইতেছে। একই ঘরের মধ্যে রহিয়াছি, আমার খাটের নিকট আসিতে নিদ্রার এমন ভয় বা লজ্জা কেন। মশারি ফেলা আছে, তাই ঢুকিতে পারে না? সকলেরই তো মশারি ফেলা। কে ঘুমকে বন্দিনী করিয়াছে যে, আসিতে পারিতেছে না? কিম্বা আমার খাটের চারি-পার্শ্বে মন্ত্র পড়িয়া কোন অদৃশ্য নিষেধ-রেখা কেহ কি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে যে, ঘুম এ-গণ্ডী কিছুতেই পার হইতে

পারিতেছে না? ঘুমের মাসী-পিসী এরা সব কোথায়, ঘুমের এ-দুর্দিনে বোনঝিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না কেন?

কানে যেন কেমন একটা শব্দ আসে। কান্নার মতই মনে হয়। কে আবার কাঁদে? জেলের এ-ঘরটাও কি সেই ক্ষুধিত-পাষাণ হইয়া আছে? অসম্ভব কি! কত হতভাগ্য এখানে অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ও কান্না রাখিয়া গিয়াছে, তা'র ইয়ত্তা আছে নাকি! কান-খাড়া করিয়া কান্নাটাকে ভালো করিয়া ধরিতে গেলাম এবং ধরিতে পারিলামও।

মশারি তুলিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি ও-ধারে একটা খোলা-জানালায় কে একজন গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার ও বৃষ্টির দিকে চাহিয়া আছে।

একটু অগ্রসর হইতেই ভুল বুঝিতে পারিলাম—এ কান্না নয়, গান। পদ পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে—"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি-পাতে।" ফণী জানালায় দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। দিনের বেলা সাহস হয় নাই, রাত্রে সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তায় এই ভয়ানক বৃষ্টি—কেহই শুনিতে পাইবে না মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীত সাধনা করিতেছে।

গানে হৃদয়ের ভাব আবেগ খুব ভালোভাবে মুক্তি পায়, সে বিশ্বাস আমারও আছে। কিন্তু এমন চাপা গলায়, মানে নাকে গাহিতেছে কেন? ইহাতে আবেগগুলি বাহির হইতে সুবিধা পাইতেছে কি? পাশে গিয়া দাড়াইলাম, কহিলাম—"বেশ গাস্ কিন্তু। আর আবহাওয়াটিও কেমন যুৎসই। উঃ, রাত্রির বুকফাটা কান্না যেন তোর গানে বেরুচ্ছে। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম, থাকতে পারলাম

না, উঠে এলাম। কিন্তু আস্তে কেন, চেঁচিয়ে গলা ছেড়ে গা না।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

শেষে কহিলাম—"তোকেও এ-রোগে ধরল?"

ফণী খেপিয়া গেল, কহিল—"না ধ'রে উপায় আছে। দশজনে তো ষড়যন্ত্র ক'রে ঢেকি গিলিয়ে ছেড়েছেন, এখন অনুরোধের ঠেলা সামলাচ্ছি আমি। পেটের মধ্যে কোনমতে জায়গা ক'রে আপোষে শান্ত হয়ে থাক, তা' না লড়াই লাগিয়েছেন কে কতটা বেশী জায়গা দখল করতে পারেন। আরে, পেটটাতো আমার রবারের থলি নয় যে, ভিতর থেকে যত গুঁতো মারবি ততই জায়গা বাড়বে। আজ ঘুমের দফারফা। উঠে এসেছি, দেখি গান শুনে যদি শান্ত হ'য়ে ঠাণ্ডা মারে।"

—"এ গানে ঠাণ্ডা না হ'য়ে উপায় আছে। জোর ক'রে গা দেখি, কেমন লড়াই না থামে।"

—"পাগল হয়েছিস্, গানের কর্ম্ম নয়। নিশ্বাস নেবার মত জায়গা পর্য্যন্ত এরা ছাড়তে চায় না। কষ্টে কোনমতে বাতাস ভেতরে নিচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা মেরে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

হাসির শব্দ পাইলাম। পঞ্চানন-বাবুর গলা। কহিলাম—"তুমি জেগে আছ, ঘুমুওনি?"

পঞ্চানন-বাবু উত্তর দিবার আগে ফণী কহিল—"ঘুমুলে যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শোনা হয় না। খোঁজ নিয়ে দেখ, মশারির তলে সবাই শুৎ পেতে আছেন। নিশ্চিন্দি হ'য়ে নিরিবিলি যে গান গাব তা'র যো নাই।"

দেখিলাম, সত্যই সবাই জাগিয়া আছেন এবং এই স্বর্গীয় সঙ্গীত

মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেম। পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"তুই তো সব মাটি করলি। আরম্ভ করতে না করতেই উঠে এলি।"

অপরাধ স্বীকার করিলাম। সত্যই মস্ত ক্ষতি করিয়া ফেলিয়াছি। এই নাকি-সুরের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে'—শুনিবার সৌভাগ্য আর হইবে না। সুযোগ জীবনে কি বারবারই আসে? না, আসে না।

একে একে সবাই বাহির হইয়া আসিলেন। আলো কয়টা জ্বালা হইল। এতক্ষণে উপেন-দাস জাগিল, কহিল—"কি ব্যাপার কি? এই রাতদুপুরে পাশা? কি অলক্ষুণে কাণ্ড, বাবা"—বলিয়া শতরঞ্চির উপর আসিয়া চাপিয়া বসিল।

এক সময়ে রাত তিনটার ঘণ্টা জেল-গেটে বাজিল। এতক্ষণে চোখের পাতা আমাদের ভারী-ভারী ঠেকিতে লাগিল। খেলা বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া সবাই টান হইলাম। এবার আর ঘুমের জন্য জাগিতে হইল না। ফণী পর্য্যন্ত গভীর ঘুমে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। বাহিরে কিন্তু বৃষ্টি তেমনি অবিশ্রান্ত ঝরিতে লাগিল।

* * * *

১৯৩০ সাল, ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে-ঢেউএ ইতিমধ্যেই এ-জেলে শ' আড়াই সত্যাগ্রহী কয়েদী আনিয়া ফেলিয়াছে। নিত্য নূতন লোক আসিতেছে—জেলের যেন সে এক উৎসব দিন। বন্ধুদের কাজ জুটিয়া গেল। তা'রা বন্দীদের নিয়া ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত তা'রা পান না। জেলের আইন রীতিমত শিথিল হইয়া উঠিল। আমরা রাত দশটায় বন্ধ হইতাম। জমাদার তালাবন্ধ করিতে আসিয়া দেখিত যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই।

জিজ্ঞাসা করিত—"পঞ্চা-বাবু কিধার গিয়া।"

ফণী কহিত—"পঞ্চা-বাবু স্বদেশী করতে ওই ধারকা নম্বরমে গিয়া। দেখগে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশী-বাবুদের সঙ্গে আলাপ করতে হ্যায়।"

জমাদার হাসিয়া ফেলিত, বলিত—'পঞ্চা-বাবু হামার নকরী খাইয়ে ছাড়বেন।"

পঞ্চানন-বাবু যখন ফিরিবেন তখন যেন তা'কে খবর দেওয়া হয়, আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া যাইবে বলিয়া জমাদার চলিয়া যাইত। পঞ্চানন-বাবু কোনদিন রাত একটায় কোনদিন দু'টায় বন্দী হইবার জন্য ব্যারাকে ফিরিতেন।

কিন্তু এ সুখ-সুবিধা শেষে আর ছিল না। সত্যাগ্রহীদের উপর মারপিট করা হয়, বাধা দিতে গিয়া ডেটিনিউরাও আহত হয়, পঞ্চানন-বাবুকে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই জেল হইতে অন্য জেলে বদলী করা হয়—এসব ঘটনা আমি পরে জানিতে পারি, কারণ এর আগেই আমি সিউড়ী জেলে চালান হইয়া আসিয়াছিলাম।

একটী ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল। তখন পর্য্যন্ত জেলে সত্যাগ্রহী-বন্দী জনকতকের বেশী আসে নাই, আমরাও মাস দেড়েকের মত হয় আসিয়াছি।

জামা-কাপড় ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষের জন্য তাগাদা দিয়া আমাদের ম্যানেজার ক্ষিতীশ-বাবু ক্লান্ত হইয়া হাইল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জেলার দেখা হইলেই বলিতেন—এই আজকালের মধ্যেই সব আনিয়া দিবেন। আজ আর কাল গড়াইয়া মাসখানেক গেল। বিছানা-বালিশ ইত্যাদি না হয় নাই আসিল, খাটে কম্বল

আর হাসপাতালের চাদর বিছাইয়াই কাজ যেমন চলিতেছে তেমন চলিতে পারে। কিন্তু কাপড়ের কাজতো আর কম্বল পরিয়া চলিবে না। গা ঢাকিয়া ভদ্র হইবার জন্য কয়েকটা গেঞ্জিও তো আবশ্যক। জেলার-বাবু সবই বুঝিতে পারেন দেখিলাম। কিন্তু জিনিষগুলি আনাইয়া দিতে কেন যে পারিতেছেন না, এ-দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে কিনা, কিম্বা এগুলি আমাদের হস্তগত হইলে ইংরেজ সরকারের আর রক্ষা থাকিবে না—এসব কোন কিছুই ঠাহর করিয়া উঠা গেল না। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্যের সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ-বাবু পরিষ্কারই জানাইলেন—"পারেন তো আপনারাই জিনিষ-পত্তর আদায় করে নেবেন, আমাকে দিয়ে ও-কাজ হবে না। কাহাতক পারা যায়—গালাগালি দিলে পর্য্যন্ত হুঁস হয় না। বিশ্বেস করবেন না, শালা পর্য্যন্ত বলেছি। কিন্তু কোন কাজেই এল না।"

কয়েদী কাঙ্গালী পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। চটিয়া গিয়া জেলারের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়া যাহা কহিল, তা'তে এত রাগের মধ্যে ক্ষিতীশ-বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। কাঙ্গালী জানিতে চাহিল যে, জিনিষগুলি কি জেলারের পিতার সম্পত্তি দিয়া ক্রয় করিতে হইবে যে, সে এমনতর তাল-বাহানা করিতেছে। বলার মত বলিলে পিতা-পিতা বলিয়া জিনিষ পৌঁছাইয়া দিবার সময় পাইবে না। ভদ্রমানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি—তা'তে কাঙ্গালীর আপত্তি নাই। কিন্তু জেলার ভদ্রলোক নহে, আসলে সে চামার—এ গোপন সম্বাদও সে আমাদিগকে জানাইয়া দিল।

পরদিন ভোরের ব্যাপার।—জেলের অন্যান্য অংশ পরিদর্শন শেষ

করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের নম্বরে আসিলেন, সঙ্গে জেলার, ডেপুটি জেলার, নায়েব, হাসপাতালের ডাক্তার, জমাদার ও কয়েকজন সিপাহী। বারান্দা হইতে কথা বলিতে বলিতে তিনি এক সময়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। আমরা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে শ্রদ্ধা করিতাম। বয়স্ক মানুষ, চোখেমুখে একটা উদার শান্তভাব, যখনই আসিতেন তখনই আন্তরিকতার সহিত আমাদের সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। আমাদের জন্য তাঁ'র স্নেহ এমন অকপট ছিল যে, ব্যবহারে তাহা গোপন থাকিত না। সরল ও উদার এই বয়স্ক বাঙ্গালী সিভিল-সার্জ্জেনের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা কোন কারণেই নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে নাই। এঁর আলোচনা দীর্ঘদিন পরেও বক্সা ও দেউলীতে বসিয়া শ্রদ্ধার সহিতই আমরা করিতাম।

সুপার দল-সহ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চানন-বাবু দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। এজন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ তাঁ'র কি অভিসন্ধি ছিল তাহা পূর্ব্বাহ্নে আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। সুপার জিজ্ঞাসা করিলেন—"দরজা বন্ধ করলেন যে?"

আমরাও কারণ জানিতাম না, তাই পঞ্চানন-বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"স্যর, আপনার জেলার আমাদের এখানে confined থাকবেন।"

—"কেন?"

—"আপনি জানেন না, স্যর, আপনার জেলার কি-জাতীয় লোক। একমাস তাগাদা দিয়েও কয়েক জোড়া কাপড় পর্য্যন্ত আদায় করতে পারিনি।"

—"কেন, আমি তো অনেক আগেই আপনাদের অর্ডার সই ক'রে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা জিনিষ পান নি?"

—"আপনার জেলারকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

সুপার জেলারের দিকে চাহিতেই জেলার-বাবু ঘরের মধ্যে উন্মাদের মত পায়চারী করিতে করিতে যাহা উত্তর দিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে—অন্যের উপর ভার দিয়া তিনি অখাদ্য-ভক্ষনকারীর কাজ করিয়াছেন, আজই রাত্রের গাড়ীতে তিনি স্বয়ং কলিকাতা যাইবেন, পরশ্ব-তারিখ ভোরে এই সময়ে মাল আমাদের নম্বরে পৌছাইয়া দিয়া তবে তিনি জল-স্পর্শ করিবেন, এ যদি তিনি না করেন তবে তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান নহেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখিলাম, জেলার অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছেন। ভয়-জিনিষটা এমনই সংক্রামক যে, এক সুপার ব্যতীত সবাই আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, সিপাহীদের মুখে পর্য্যন্ত ভয়ের চিহ্ন। বিশেষ করিয়া জেল-হাসপাতালের বেঁটেখাটো ডাক্তারটি দেখিলাম ঘাবড়াইয়াছেন বেশী, তিনি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রীতিমত কাঁপিতে-ছিলেন।

সুপার পঞ্চানন-বাবুকে শুধু ভালোই বাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। কহিলেন—"পঞ্চানন-বাবু আপনার জিনিষ পাবেন, আমাদের যেতে দিন।"—স্বর একটু গম্ভীর ঠেকিল।

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"স্যর আপনাকে detain করার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনার সামনে এটা ঘটে, এ আমার ইচ্ছা ছিল না।—ফণী দরজাটা খোল। স্যর, আমাকে বিশ্বাস করবেন, আপনাকে আমি ধ'রে রাখিনি।"

ফণী দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিল।

কিন্তু সুপার একটুও নড়িলেন না, শান্তভাবে বলিলেন—"পঞ্চানন-বাবু, I want to take my Jailor with me. আমার জেলে আমাকে আপনি দশ মিনিট আটক করে রেখেছেন—আপনি কি মনে করেন না যে, you have gone too far ?"

পঞ্চানন-বাবু উত্তর দিলেন না।

সুপার আবার বলিলেন—"আমার জীবনে এতবড় অসম্মান কেউ আমাকে করেনি, আপনি আজ যা' করলেন। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যাই।"

ভদ্রলোকের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"স্যর, আপনাকে কেউ আটকায়নি। আপনার দরজা খোলা আছে, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

—"না, আমি জেলারকে নিয়ে যেতে চাই।"

—"আমাকে মাপ করবেন, আমি জেলারকে যেতে দিতে চাইনা। কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে ক'রে স্বভাব এদের এমন হয়েছে যে, মানুষ বলে কাউকেই মনে করেন না। এ ভুল-ধারণা ভাঙ্গবার দরকার হয়েছে। আমাকে আপনি অনুরোধ করবেন না, জেলার এখানেই থাকবেন। জিনিষপত্তর পাওয়ার সঙ্গেই তিনি যেতে পারবেন, এক মিনিট বেশী আমি তাকে ধ'রে রাখব না।"

অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল। জেলার এই কথাবার্ত্তার মধ্যেও ছটফট করিয়া ঘরের মধ্যে হাটাও বন্ধ করেন নাই, কিম্বা নিজের কথাও থামান নাই—কৈফিয়ৎ ও প্রতিশ্রুতি সমানভাবে দিয়া

চলিয়াছেন। সুপার গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পঞ্চানন-বাবুও তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই পক্ষের একপক্ষ নরম না হইলে এ-অবস্থার পরিণতি যে কি হইবে, ভাবিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। পঞ্চানন-বাবুকে চিনি, সেদিক দিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর সুপারই বা জেলারকে এদের হাতে রাখিয়া কেমনে যান।

যতীনদা অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"স্যর, জেলার-বাবুর উপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আমাদের নেই। আপনি যদি কথা দেন যে, আজ হোল সোমবার, সামনের বুধবার রাত্রের ভিতর আমরা আমাদের দরকারী জিনিষগুলি পাব, তবে আমি পঞ্চাননবাবুকে ব'লে দেখতে পারি।"

সুপার কথা বলিবার আগেই জেলার আগাইয়া আসিয়া বলিলেন —"আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, কথা দিচ্ছি, নিজে কলকাতা থেকে মাল এনে আপনাদের দিয়ে যাব।"

যতীনদা' তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন—"থামুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে, এঁর সঙ্গে কথা বলছি, আপনি চুপ করুন।"

সুপার কহিলেন—"যতীনবাবু, you shall get your articles by Wednesday."

যতীনদা কহিলেন—"পঞ্চানন, তবে এঁরা যেতে পারেন, কি বল?"

পঞ্চানন-বাবু কহিলেন—"স্যার, যতীনদা' কথা দিয়েছেন, বাধ্য হয়েই আপনার জেলারকে ছেড়ে দিতে হোল। আপনার জেলারকে kindly একটু সতর্ক করে দেবেন যেন এরকম unpleasant কাজ আমাকে আর না করতে হয়।"

তারপর একটু থামিয়া কহিলেন—"আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। বিশ্বেস করবেন যে, আপনাকে অসম্মান করার মত ইচ্ছা আমাদের কারু নাই, কোনদিন হবে না। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।"

সুপার শেষের দিক হইতেই গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—"আপনাদের articles আপনারা ঠিক সময়েই পাবেন।"

জেলারকে বলিলেন—"যে কোন রকমেই হোক বুধবারের ভিতর মাল পৌঁছে দেবেন,"—বলিয়া দল হইতে একটু আগে একাকী আমাদের কম্পাউণ্ড হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আসিয়া পড়িল, পূজার আর মাসখানেক বাকী, এমন সময় ফরিদপুর-জেল হইতে সিউড়ী-জেলে আমাকে স্থানান্তরিত করা হয়। বন্ধুদের এই ভরা-হাটে আমিই প্রথম ভাঙন আনিলাম। বিদায় দিতে অনেকেই ব্যথা পাইলেন, কিন্তু পিছনে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। ম্লানমুখে জেলগেটে তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নূতন গৃহের উদ্দেশ্যে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

এক জেল হইতে অন্য জেলে যাইতে মনের যে-অবস্থা হয়, তাহা অপরের আন্দাজ করিয়া বুঝা সম্ভব নহে। অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য হয় শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষের কিছু প্রতিধ্বনি না থাকিলে কোন অনুমানই প্রমাণে উন্নীত হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া মনের সে-অবস্থা জানার অন্যপথ নাই।

এক ইংরেজ সাহিত্যিক জীবনকে একটী পাখীর সহিত তুলনা করিয়াছেন—বাহিরের অন্ধকার হইতে এক দরজা দিয়া আলোকিত কক্ষে এ-পাখী আসে, কিছুক্ষণ পাখা ঝাপটাইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়ে বেড়ায়, পরে একসময়ে আর এক দরজা দিয়া বাহিরের তেমনি অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। এর সঙ্গে আমাদের মিল আছে, কিন্তু অন্য রকমের। পাখীটি অনন্ত অন্ধকার হইতে ক্ষণিকের আলোকে আসে—আমরা খণ্ড আবদ্ধ আবেষ্টনী হইতে ক্ষণিকের অসীমতায় আসি, আবার এক সময়ে সেই লৌহ-আবেষ্টনীর ক্ষুদ্র আবদ্ধতায় গিয়া আশ্রয় নেই। পাখীটি মুক্তি হইতে বন্ধনে আসিয়া পড়ে—আমরা বন্ধন হইতে উন্মুক্ততায় আসি। এই ক্ষণকালের মুক্তি-আস্বাদনে মনের যে-অবস্থা হয়, তাহা অপরের অনুমান করিয়া বুঝা সম্ভব নয়, এই আমার ধারণা। আমি নিজেও তো বহুবার 'বন্ধন হইতে মুক্ত হইল' এ জাতীয় কথা ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমরা যে-সমস্ত কথা ব্যবহার করি তা'র সঠিক অর্থ জানি না এবং যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহা আসল-জানা হইতে বহুক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ও ভুল-জানাই থাকিয়া যায়।

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া এই এতদিনের জানা-পৃথিবীকে একেবারে নূতন মনে হয়। বহুদিন রোগে ভুগিয়া একটী ঘরে যাকে থাকিতে হইয়াছে, সে যখন বাহিরে আসিয়া প্রথম সুস্থ চোখে পৃথিবীকে দেখে তা'রও তখন পৃথিবীকে একটু নূতন নূতন লাগে। কিন্তু তা'র সঙ্গে আমার অবস্থার ভয়ানক একটা ব্যবধান আছে। তা'র মনে কোন প্রচ্ছন্ন ও পীড়াদায়ক জ্ঞান থাকে না, তা'র সমস্ত

আস্বাদনের পিছনে কেহ বার বার একথা স্মরণ করাইয়া দেয় না যে —তাড়াতাড়ি কর, একে এখনই তোমার চোখের ও মনের আড়ালে সরাইয়া নেওয়া হইল বলিয়া। এক চোখে কেবল জল গড়াইয়া পড়িবে, অন্য চোখে হাসির আলোক খেলিয়া যাইবে—এমনই কঠিন সে মানসিক পরীক্ষা।

মন যে কত লোভী ও পিপাসী হইয়া উঠিয়াছে, যাত্রার এই অবকাশটুকুর মধ্যে তাহা টের পাই। এত লোভ যে এই মনেই গুপ্ত ছিল, জেলে থাকাকালীন একদিনও সন্দেহ করি নাই, কিন্তু বাহিরের মুখোমুখী আসিতেই এরা সব কোথা হইতে এত উগ্র ক্ষুধা নিয়া বাহির হইয়া আসে। মনে হয়, কতকাল যেন মানুষের সঙ্গ পাই নাই।

ট্রেণের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, লাইনের পাশে খালের জলে কয়েকটী মেয়েছেলে মাছ ধরিতেছে, বোধ হয় সাওতাল হইবে। খোলা গা, কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা। উপরের আকাশ ও নীচের এই নির্জ্জন মাঠের মতই তা'রা সহজ ও নগ্ন। ট্রেণ লৌহ-পথে ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, মৎস্য-শিকারীরা পিছনে সীমান্তে সরিয়া গেল।

মানুষের মন—সাড়ে তিন-হাত শরীরের মধ্যে কোথায় যে সে বসিয়া আছে জানি না। সে-মনকে চোখে দেখা যায় না, হাতের মুঠায় ধরা যায় না—অথচ এই দেহেই সে রহিয়াছে। শরীরে থাকিয়াও সে শরীরী নয়। কিন্তু সেই অশরীরী মন এত লোভ, এত কামনাকে আশ্রয় দিয়া রাখে কেমনে, যা'র জন্য সমস্ত জীবন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়া মানুষ ছুটিতে বাধ্য হয়! কোথায় কতদূরে ওরা মাছ ধরিতেছে, চোখের দেখায় তার শেষ হয় না, মনের কাছে সে-

সম্বাদ পৌঁছিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখি! একপাল পশু যেন এতকাল শিকলে বাঁধা থাকিয়া অনাহারে উপবাসে শুকাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। তা'দের শিকল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ছাড়া পাইয়াই ছুটিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইবে ধারালো নখে ও দাঁতে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইবে।

কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করে, এ-ক্ষুধার কোন অর্থ আছে কি? যে-লোভ মনের মধ্যে প্রেত-মূর্ত্তির মত বিচরণ করিতেছে, সে-লোভ বাহিরের বস্তু দেখিয়া জিভ্ বাহির করিতে চায় কেন? ভিতরের জিনিষ বাহিরে আসিতে পারে কি? মন নিজেই তো শরীরে আবদ্ধ। নিজের চিন্তা, আশা, ইচ্ছা ইত্যাদির মধ্যেই সে বিচরণ করিতে পারে। সেই মন কিম্বা তা'র লোভ বাহিরে আসিবার জন্ত এমন ছটফট্ করিয়া মরে, এ ব্যর্থ শক্তি-ব্যয় কেন হয়? আমার শত ইচ্ছা থাকিলেও তো আমার মন বাহিরে গিয়া ওদের সান্নিধ্য পাইতে পারে না।

বস্তু-জগৎ পড়িয়া আছে, তা'র আড়ালে বা উপরে ইন্দ্রিয়-জগৎ থাকিতে পারে, মানে আমি বড়জোর চোখ মেলিয়া দেখিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের বিষয় করাই কি তবে বস্তুকে আয়ত্ত করা? তাহা হইলেই কি দেহাবদ্ধ মন মুক্তি পায়, অশরীরী কামনাগুলি শরীরী হইয়া উঠে? কে জানে!—আমি শুধু জানি কোথায় কোন দেখা-শোনা-ছোঁয়ার জিনিষ রহিয়াছে—চোখ-কান এরাতো দেখিয়া শুনিয়াই খালাস, এর বেশী আগাইতে পারে না—আর এই শরীরের মধ্যে যে-জিনিষটার শরীর নাই, যা'কে 'আমি' বলিয়া জানি, যাকে 'মন' বলিয়া বুঝাইয়া থাকি, সে

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সে কে, কি তার পরিচয়—এ আমি জানি না।

চোখের আড়ালে থাকিয়া আমি পৃথিবীকে রূপময় দেখিয়া শান্ত থাকি না, চোখের জানালার ওধারে দ্রষ্টা-আমার পাশেই একদল লোভ-আশা-কামনা মাতালের মত আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। এই আমার শরীরে এতগুলি বিভিন্ন বস্তু আশ্রয় নিয়াছে, যেমন আমিও নিয়াছি। এ-রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার সম্ভাবনা নাই—এ আমি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, এত ক্ষুধা, এত কামনা ও এত লোভ অশরীরী প্রেতের মত মনকে আশ্রয় করিয়া এই শরীরে বাসিন্দা হইয়াছে, এই শরীরকে ধ্বংস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার আগে তা'রা বিদায় নিবে না। এই শরীর পুড়িয়া ছাই হইলে হয়ত অন্য কোন শরীরে এই প্রেতের দল ভর করিবে, কিম্বা এই দেহ-ভস্মেই অপেক্ষা করিবে। একদিন হয়তো আকাশ হইতে আহ্বান আসিবে—"ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়, হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।" অতনু মন প্রেত-সঙ্গীদলকে নিয়া আবার উজ্জীবিত হইবে—আজ যেমন খালের জলে ওদের দেখিতে পাইয়া এরা মৃত্যু-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে জানে, এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পরমাণু-কণায় কোন বিরাট-মন তা'র প্রেতের দলসহ ছড়াইয়া আছে কিনা, যা'র জন্য ধূলিটার পিছনে পর্যন্ত লোভকে গা নাড়া দিতে দেখি। কোন বিরাট-দেহের চিতার ছাইতে এ পৃথিবী গঠিত হইয়া থাকিবে, তাই প্রতি তনুতে অতনু মনগুলির তনু-পিপাসা দেহাশ্রয় পায়। বোধ হয় অনাদি সময় হইতেই এ রকম হইতেছে। শুধু অনাদি যদি হইয়া থাকে, যদি অনন্ত না হয়—তবে এর বাহিরে যাইবার পথ থাকিলেও

থাকিতে পারে। কিন্তু যা'র আদি নাই, তা'র অন্ত থাকিবে—এতবড় বিশ্বাস মানুষ কোন সাহসে করিবে?

* * * * *

আমরা তখন সিউড়ী-জেলে, এমন সময় গুজবটা আসিল। শোনা গেল, সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন যে—জেলে আর সেই সব বন্দীদের রাখা হইবে না যা'রা ভয়ানক, যা'দের জন্য জেলের আইন-কানুন ঢিলা হইয়া পড়ে, যা'রা সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মিশিয়া দল পুষ্ট করে এবং বাহিরে খবর দেওয়া-নেওয়া করে। তা'দের বাছিয়া নিয়া সরকার সরাইয়া রাখিবেন, জায়গাও ঠিক হইয়াছে। বাংলা ও ভূটানের সীমান্তে বক্‌সাতে পাহাড়ের উপর সরকারের একটা কেল্লা আছে, বন্দীদের জন্য তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই দুর্গের মিলিটারী-অফিসারের হাতে এদের ভার ন্যস্ত করা হইবে।—কিছুদিন পরে শুনিলাম, যেই কথা সেই কাজ, বক্‌সাতে লোক নাকি চালান সুরু হইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি-জেল হইতে আমাদের জেলে বদলী হইয়া আসিলেন ডাক্তার জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা। হউক না রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তবু তিনি রাজধানীর প্রধান জেলের আমদানী বন্দী, পদ-মর্য্যাদা তা'র আছে বৈকি। আমরা নূতন সাথীকে ঘিরিয়া লইয়া বসিলাম—"কি বারতা রে দূত!"

তিনি বক্‌সার যে-বর্ণনা আমাদিগকে শুনাইলেন, তাহাতে আমাদের শরীরের কোন কোন যন্ত্রপাতি চমকাইয়া উঠিল। লোকটার মতলব কি? ভয় দেখাইতে ভালবাসেন বুঝি? তবে তো স্বভাব মোটেই ভাল নয় দেখিতেছি। উপরটা যেমন কালো,

ভিতরটিও কি তদ্রূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ? কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও আমাদের ধারণা তেমনি দৃঢ় রহিয়া গেল যে, ডাক্তার শর্ম্মা সত্য খবরই কহিতেছেন। কেন, মানুষ কি কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা কহিতে পারে না? সত্যি বলিতেছি যে, এ-ক্ষেত্রে যদি শর্ম্মাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতে পারিতাম, তবেই আমরা খুসী হইতে পারিতাম। সত্য কথার মত কষ্ট-দায়ক ও দুঃখ-কারক আর কোন বস্তু নাই, এমনই একটা বিশ্বাস সেদিন আমাদের হইয়াছিল।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে—বক্‌সা যে ভয়ানক স্থান, সেখানে যে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে একান্ত বাধ্য, অর্থাৎ তাহার ভীতি-জনকত্ব প্রমাণ হইতে পারে এমন কোন সঠিক কিছু খবর শর্ম্মাও বলিতে পারে নাই, আমরাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু তবু বক্তা ও শ্রোতা সকলেই আমরা এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া রহিলাম যে—"ভিডি ঐ চল্লো।" ভয় যা'কে ধরে এমন করিয়াই ধরে যে, অবিশ্বাসের আর কোন জায়গা রাখে না। এমন কি, একদিন জেলার ভদ্রলোক পর্য্যন্ত বক্‌সার বিষয়ে এমন ভাবে বলিলেন যে, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বন্দীদের শায়েস্তা করিবার আয়োজন সত্যই হইতেছে।

চেয়ারে বসিয়া জেলার এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বক্‌সার কথা শুনেছেন তো? অদৃষ্টে অনেকের দুঃখ আছে।"

তাঁহাকে জেরা করিয়া কিন্তু বুঝা গেল যে, তিনিও বিশেষ কিছু জানেন না, তবে শুনিয়াছেন সে নাকি ভয়ানক ব্যাপার।

আমাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা জেলারবাবু, সৈন্যদের মত দু'বেলা প্যারেড্ করাবে নাতো?"

জেলার চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া লইয়া কহিলেন—"তা'তো

করাবেই। নইলে কোর্টেই বা নেবে কেন, আর মিলিটারীর জিম্মায়ই বা দেবে কেন।"

—"আচ্ছা, উঠতে বসতে দেখা হলেই বোধ হয় অফিসারদের সেলাম করতে হবে ?"

জেলার তেমনি দ্বিধাহীন জবাব দেন—"তাতো হবেই। মিলিটারীদের ডিসিপ্লিনই তো সব, ও ভাঙ্গবার যো নাই। তা' হ'লে একেবারে কোর্ট-মার্শাল।"

আর এক বন্ধু জানিতে চাহিল—"নিজেদেরই বোধ হয় পালা ক'রে পাহারা দিতে হবে ?"

জেলার সামান্য একটু ভাবিয়া লইয়া কহিলেন—"বাইরের গেটে ওরাই থাকবে। ভিতরে নিজেদের পাহারা দিতে হবে, সে তো ধরা কথা।"

ধরা-কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তা চুপ করিলে অপর একজন প্রশ্ন করিল —"সেখানে বোধ হয় ঠাকুর চাকর বা কয়েদী নাই ?"

জেলার দুই চক্ষুর উপরের দুই ভ্রূ আরও একটু উপরে টানিয়া লইয়া উত্তর দিলেন—"কি, ঠাকুর চাকর ? পাগল হোয়েছেন, ও-সব থাকবে ওখানে ! দুর্গের ভিতর কাক-চিলের পর্য্যন্ত ঢোকার নিয়ম নাই।"

—"তবে রান্না-বান্না কাজ-কর্ম্ম চলবে কেমন ক'রে ? তা'ও কি নিজেদের করতে হবে ?"

—"তবে কি না খেয়ে মরবেন ? খেতে যখন হবেই, তখন রান্না না ক'রে উপায় কি।"

বলিয়া জেলার-বাবু একমুখ-ধোঁয়া শূন্যের দিকে উর্দ্ধ-মুখ হইয়া

মুক্ত করিলেন। এই জেলার লোকটিকে আমরা এতকাল ভালো বলিয়াই জানিতাম। এখন দেখিতেছি, তিনি রীতিমত ভয়ানক লোক। অন্যের বিপদে এমন নিশ্চিন্ত হইয়া যিনি চুরুট টানিতে পারেন—যাক, ভগবান আছেন, তাঁ'র কাছে তো কোন পাপ গোপন থাকে না, তিনিই ব্যাটাকে দেখিয়া লইবেন।

জেলার-বাবু কহিলেন—"আমাদের এখান থেকে কেউ যাবেন নাকি ?"

—"কেন, কোন খবর পেয়েছেন নাকি ?"—আমরা চাপিয়া ধরিলাম।

জেলার উত্তর দিলেন—"খবর এলে জানতেই পাবেন, আমি তো আর যাচ্ছি না—আপনারাই যাবেন।"

বুঝিলাম, আস্ত সয়তানের পাল্লায় পড়িয়াছি। তবু নাছোড়-বান্দা হইয়া আমাদের একজন প্রশ্ন করিলেন—"তা'তো ঠিকই, যেতে হ'লে আমরাই যাব, আপনাকে কেন আর টানা-হেঁচড়া করব। সত্যি বলুন, কোন খবর পেয়েছেন কি না ?"

এবার জেলার একটু হাসিলেন, কহিলেন—"না, আমরা কোন খবর পাই নি। তবে পুলিশ-ক্লাবে কাল সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল, শুনলাম যে, এখান থেকে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন যেতেও হয়তো পারেন।"

—"নাম শুনেছেন ?"—আমরা প্রশ্ন করিলাম।

—"না, নাম শুনি নি। ওরাও আমাদের মতই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে। যদি অর্ডার আসেই তবে আগেই জানতে পাবেন, কথা দিচ্ছি।"

ভরসা দিয়া জেলার-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আফিসে কি কাজ আছে, যাইতে হইবে, তাই আর বিলম্ব করিলেন না।

'সময় যখন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে'—এই ভাব নিয়া আমরা দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

বলিতে লজ্জা নাই, আমোদে-আহ্লাদে গল্পে-গুজবে হৈ-হৈ করিয়া দিনগুলিকে আমরা দুই হাতে উড়াইয়া দিতে লাগিলাম। সময়ের যেন সে-দিন পাখা গজাইয়াছিল। আর আজ? আজ সময় কাটিতেই চায় না, তা'র পাখাদুটা যেন কেমন করিয়া কাটা পড়িয়াছে। নদী আর কাল-গতি উভয়েই নাকি সমান। তা' হইলে বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর সমস্ত নদী এতদিনে পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত মন্থর হইয়াছে, জল নিয়া আর চলিতে পারে না। কিম্বা—সমস্ত নদীর জল শুকাইয়া গিয়াছে, স্রোতও মরিয়া গিয়াছে, মরা-নদীর শুষ্ক বালু-কঙ্কালে গতি আর গতায়াত করে না। আজিকার সময়ের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলে নদীগুলির এছাড়া আর কিই বা পরিণতি হইতে পারে, আমি তো বুঝি না।

কিন্তু সাত বছর আগে এমন ছিল না। সময় যেন যুদ্ধের ঘোড়া, ধাইয়া চলিয়াছে—ক্ষুর-ঘর্ষণে ঋতু-আবর্ত্তিত হইতেছে, আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ পরস্পরকে ঘিরিয়া নাচিয়া ধাইয়া চলিয়াছে। সময়ের ঘোড়াকে সে-দিন কে যেন কঠিন চাবুক মারিয়া ক্ষেপাইয়া লইয়া উন্মত্তের মত ছুটাইয়াছিলেন। আমাদেরও সে-নেশা লাগিয়াছিল। আমরা দুই হাতে দিন-রাত্রি আকাশে উড়াইয়া দিতাম।

সিউড়ী-জেলে আমরা ছিলাম চৌদ্দজন। আর অন্য দিকে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল শ'কয়েক। মেলা-মেশা আইনে নিষেধ

ছিল, কিন্তু কার্যে নিষেধ ছিল না। কারণ, সত্যাগ্রহীরা এ-নিষেধ মানিয়া চলিত না। আর, আমাদের তো নিষেধ মানিলে কাজ চলে না। ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল।

কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার শরচ্চন্দ্র-মুখার্জ্জীর সাহায্যে ও অন্যান্য সকলের উৎসাহে সত্যাগ্রহীরা পূজার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। পূজার ভোজ খাইলাম এবং সত্যাগ্রহীদের অনুষ্ঠিত থিয়েটার পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

থিয়েটারের কথা আজও বেশ পরিষ্কার মনে আছে। যে-পিস্তলটী দিয়া গোবিন্দ-লাল রাত্রে রোহিণীকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল, পরের দিন ভোরে বন্ধুবর শচীশ-সরকারের হাতে সেই স্মরণীয় বস্তুটী দেখিতে পাইলাম। জানি না, জিনিষটি তিনি রক্ষা করিয়াছেন কি না। না করিয়া থাকিলে করা উচিৎ ছিল। নানা কারণেই সে-বস্তুটি সযত্নে রক্ষার যোগ্য ছিল।

দেখিলাম, গাছের ছোট্ট একটি বাঁকা ডালই পিস্তলের কাজটা চালাইয়া দিয়াছে। কিন্তু কাজটা অপরের দোষে নিখুঁত-ভাবে হইতে পারে নাই, বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া, তাহাই বলিতেছি।—

ভয়ানক সময় উপস্থিত হইল। গোবিন্দ-লাল বুঝিল, রোহিণী পাপিষ্ঠা, পর-পুরুষে আসক্তা। তা'র জন্য খামোকা ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছে, খামোকা অকলঙ্ক-চরিত্রে কালি লাগাইয়াছে—দুঃখে ও কষ্টে গোবিন্দ-লালের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মানুষের বুকতো, কিছু আর লোহা-পাথরে বানানো নয়। ভিতরে তা'র যে-উত্তাপ ও জ্বালা, তা'তে বুঝি লোহাও গলিয়া যাইত। কান্না ও

ক্রোধে-মিশানো গলায় গোবিন্দ-লাল প্রশ্ন করিল—"তুমি কি-ঈ রোহিণী ?"

তারপর ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়াইয়া লইয়া কহিল—"এই দেখ পিস্তল !"

রোহিণী পিস্তল দেখিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, দেখিয়াই রোহিণী ভয় পাইয়াছে।

গোবিন্দ-লাল তেমনি আছে, হাত একটুও বাঁকাইলনা, বরাবর টান রাখিয়াই জানিতে চাহিল—"কেমন, মরতে পা-রবে ?"

রোহিণী মরিতে পারিবে না, কারণ ভরা-যৌবন, নানা সাধ-আহ্লাদ ইত্যাদি বিস্তর অন্তরায় আছে।...না-না, তা'র বাঁচা হইবে না। রোহিণী বাঁচিলে অনেক লোকের অসুবিধা হইবে, তা'দেরও সাধ-আহ্লাদ তা'কে (রোহিণীকে) দেখিয়া জাগিয়া বসিবে, যেমন তা'র (গোবিন্দ-লাল) জাগিয়াছিল। না—তা'র বাঁচা হইবে না, হইতে পারে না, গোবিন্দ লাল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে···উহুঁ, এর আর নট্ নড়ন, নট্ চড়ন।

গোবিন্দ-লাল ডানপা সামনে বাড়াইয়া লইল—পিস্তলশুদ্ধ ডান-হাত কিন্তু তেমনি রোহিণীর মুখের দিকে প্রসারিত আছে। গোবিন্দ-লাল আজ সত্যই ঘাতক।

রোহিণী কাঁদিয়া ফেলিল। ভঙ্গীভরে উত্তোলিত দুইহাতে মুখের সম্মুখে একটা ভঙ্গুর আচ্ছাদন রচনা করিয়া কহিল—"না না, মেরো না।"

আমরা দম বন্ধ করিয়া রহিলাম। গোবিন্দ-লালের লাল চক্ষুতে ক্ষমার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। গোবিন্দ লাল কহিল—"তুমি মর-ও," বলিয়া পিস্তল টিপিয়া দিল।

কিন্তু আওয়াজ হইতেছে না কেন? ক্রুদ্ধ গোবিন্দ-লাল উম্বিংসের দিকে ঘাড় বাঁকা করিয়া চাহিল। পিস্তলের আওয়াজটা বোধ হয় সেখান হইতে আসার কথা, তা'র কাজ ছিল শুধু পিস্তলটা টিপিয়া দেওয়া। আওয়াজ আসিতেছে না—গোবিন্দ-লাল পিস্তল বাগাইয়া রাখিল। এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রোহিণী বজ্জাত ঘোড়ার মত খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল, আওয়াজ-না-আসা পর্য্যন্ত যতটুকু পারে বাঁচিয়া লওয়ার মতলব তা'র। অবশেষে, যাঁর উপর ভার ছিল, তিনি আওয়াজ ছাড়িলেন। রোহিণী ধপাস্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং মরিয়া রহিল। পর্দাও ঝপাং করিয়া নামিয়া পড়িল।—এতক্ষণে আমরা নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া কুম্ভকের কষ্ট হইতে বাঁচিলাম।

বন্ধুবর শচীশ-সরকার দেখি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলাম—"কোথায় যাচ্ছেন? থিয়েটার শেষ হয়নি, আরও বাকী আছে, বসুন।"

"আসছি"—বলিয়া তিনি গ্রীণ-রুমের দিকে চলিয়া গেলেন। থিয়েটার সুরু হইতে তিনি এক সময়ে আসিয়া নিঃশব্দে নিজের জায়গায় বসিলেন। কিন্তু কোথায় ও কেন গিয়াছিলেন, তখন আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

ভোরে একটু বেলা করিয়া ঘুম ভাঙ্গিল, থিয়েটার শুনিয়া আসিয়া ঘুমাইতে অনেক রাত হইয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া ছিলাম। কয়েদী আসিয়া মশারি তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে শচীশ-বাবু ঘরে ঢুকিলেন।

আমার নাকের ডগার সামনে কি একটা বস্তু ধরিয়া কহিলেন—"এই দেখুন পিস্তল। কেমন মরতে পা-রবেন?"

—"দেখি, আমার হাতে একটু দিন তো।"

আবেদন গ্রাহ্য হইল না। অন্যান্য সকলের দিকে পিস্তলের মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া শচীশ-বাবু কহিলেন—"আপনারা অনেক পিস্তল দেখেছেন, কিন্তু এ-রকমটী আর দেখেন নি, আমি জোর করে বলতে পারি। এর কত সুবিধে জানেন? এ-পিস্তল থাকে একজনের হাতে, শব্দ থাকে অপরের মুখে, শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে "রোহিণী তবে তুমি মরও," সঙ্গে-সঙ্গেই কার্য্য-সিদ্ধি, না ম'রে আর রক্ষা নাই। এ-রকম পিস্তল যদি আপনাদের থাকত, তবে এ-দেশের সাহেব সাবাড় করতে একটা মাসও লাগত না। এ-পিস্তল তাই আমি কাল স্বয়ং গিয়ে গ্রীণ-রুম থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছি।"

বাঁকা ডাল-রূপী পিস্তলকে হস্তগত করিবার জন্য অনেকগুলি ঊর্দ্ধ-বাহু দেখা গেল। অবশেষে সেটা সন্তোষ-গাঙ্গুলীর দখলে গিয়া পড়িল। সন্তোষ-বাবু সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন, বলিতেও পারিতেন, কহিলেন—"হে পিস্তল, ত্রেতায় তুমি পরশুরামের কুড়ালের আছাড়ি ছিলে, এবার কলিতে গোবিন্দ-লালের ডালের পিস্তল হইয়াছ। পরশুরাম কুড়াল দিয়া কোপাইয়া মাকে মারিয়াছিলেন, গোবিন্দ-লাল তোমাকে দিয়া রোহিণীকে মারিলেন। কিন্তু রোহিণী কে?"—

বলিয়া সন্তোষ-বাবু চারিদিকে জিজ্ঞাসু-চোখ ঘুরাইয়া লইলেন। এবং পরে নিজেই যোগ করিলেন—"রোহিণী কে?

······নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ,
শুধু সুন্দরী রূপসী।"

সিউড়ীর একটী সন্ধ্যার কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে আছে।

বেশ মনে পড়ে, সন্ধ্যার পর একটা বাঁধানো ইঁদারার চত্বরের উপর বসিয়া আছি। পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামিয়াছে, আকাশে কিন্তু তখনও রং মিলায় নাই। পশ্চিম দিকটার রং ধীরে ধীরে মরিয়া আসিতে দেখিলাম। একটী একটী করিয়া আকাশে তারা আসিল, তা'ও দেখিলাম। মাথার উপর দিয়া বাদুড় উড়িয়া গেল—বসিয়াই রহিলাম। ক্রমে আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল, নীচে পৃথিবীতে রাত্র দেখা দিল।

সিউড়ীর রাত্রির আকাশ সেদিন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শরৎকালের আকাশ পূব-বাংলায়ও পরিষ্কার কম নয়, কিন্তু এ-আকাশের সঙ্গে তুলনাই হয় না। যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এমন আকাশে জ্বলন্ত তারা মুঠা মুঠা ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া সন্দেহ থাকেনা যে, প্রত্যেকটি তারার পিছনে কোন্ এক অদৃশ্য শিল্পীর প্রেম-স্পর্শ রহিয়াছে। প্রিয়-সোহাগিনীকে কে যেন সযত্নে সাজাইয়া লইয়াছে—এখন পরম পরিতৃপ্তির সহিত সারা রাত্র ভরিয়া দেখিবে। এ-আকাশের তুলনা নাই।

বছর দেড়েক দুই পরে আর এক আকাশ দেখিয়াছিলাম দেউলীতে গিয়া। তা'ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এ-কথায় সে-মরুভূমির আকাশের কিছুই বোঝা যায় না। রাজপুতনার আকাশে কোথাও স্নিগ্ধতা নাই, সে-আকাশের সব শ্যামল লাবণ্য আগুণে পোড়াইয়া নিঃশেষে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কবি বলিয়াছিলেন, "রাজপুতানীর দেহে কোথাও নাই কি কোমলতা?" কেমন করিয়া থাকিবে? থাকিবার কথাও নহে। এমন নির্মম আকাশের তলে জন্মিয়াছিলেন, তা'রই আচ্ছাদন তলে দিনে দিনে বাড়িয়াছিলেন, তাই রাণী-পদ্মিনী সহস্র সখী নিয়া জহর-আগুনে স্নান করিতে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন। সে-আকাশে দয়া নাই, মমতা নাই, চাহিলে চোখ পুড়িয়া যায়—অনন্তকাল ধরিয়া ওখানে যেন তপতী সীতার অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে।

আমার মাথার উপর সিউড়ীর আকাশ বহু পূর্ব্বেই সন্ধ্যার কালো জলে অবগাহন করিয়া দিনের দাহ ধুইয়া ফেলিয়াছিল। স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয়না, সেই শ্যাম-স্নিগ্ধতার দিকে চাহিয়াই চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মন তৃপ্তি-রসে আপনার মধ্যে আপনি সঘন হইয়া আসে। সমস্ত মনখানি আকাশের দিকে পেয়ালার মত ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। মনের মধ্যে সে দিন এক অদ্ভুত ভিক্ষুককে দেখিয়াছিলাম, অনন্তের দিকে পিপাসার পাত্র বাড়াইয়া কি পানীয় সে প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া! আজ ভাবি—আমারই মন, অথচ তার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি।

মগ্ন হইয়া ছিলাম, বিশেষ কিছু ভাবিতেছিলাম, তা'ও নয়। বরং চিন্তা-স্রোত যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল এবং কি এক অপূর্ব্ব-

রস মনের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। ধ্যান-রসের সম্বাদ রাখি না, অথচ এযে কি-রস তা'রও সংজ্ঞা আমার জানা নাই।

এমন সময় আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলাম। সজাগ হইয়া চাহিতেই দেখি ঢাকার ঝুমু-বাবু (হীরেন-মজুমদার) পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্ধকারে তাঁ'র মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিলনা, কিন্তু স্বরে উত্তেজনার চিহ্ন এবং ভাবে খুব ব্যস্ত-সমস্ত।

কহিলাম—"কি, ব্যাপার কি ?"

—"চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন। অম্বিকা-চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে যাচ্ছে।"

—"কা'কে নিয়ে যাচ্ছে ?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

চলিতে চলিতে কহিলেন—"চাটগার অম্বিকা চক্রবর্ত্তী—আর্ম্মারী-রেইড কেসের ; অবস্থা খুব খারাপ। এই মাত্র এই জেলে নিয়ে এসেছে।"

অম্বিকা-বাবুকে আমি চিনিতাম। তাড়াতাড়ি জেল-গেটের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। কিছুদূর আগাইতেই দেখি যে, কয়েকটা লণ্ঠন লইয়া কাহারা থাইসিস-ওয়ার্ডের দিকে যাইতেছে। আগাইয়া গেলাম। দু'জন বাহক একটী ষ্ট্রেচার বহিয়া আস্তে আস্তে যাইতেছিল, সঙ্গে গুটিকয়েক সিপাই, জমাদার, ডাক্তার ও জেলার-বাবু। আমাদিগকে দেখিয়া জেলার ষ্ট্রেচার পথের মধ্যে নামাইতে হুকুম দিলেন। দেখিলাম, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার বিখ্যাত আসামী অম্বিকা-চক্রবর্ত্তীর চামড়ায়-ঢাকা দীর্ঘ কঙ্কালখানি মাত্র শায়িত পড়িয়া আছে।

অতি কষ্টে কথা কহিলেন। বলিলেন যে, শরীরের অবস্থা ভালো নয়, সামান্য কাশ দিতেই গলা দিয়া রক্ত বাহির হয়। শেষে

একটু হাসিয়া কহিলেন—"শেষকালে এইভাবে মরা—।" কথাটা আর শেষ করেন নাই। আমাকে কহিলেন—"যান যেন।"

বাহকেরা তাঁহাকে লইয়া যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের দিকে চলিয়া গেল। এই জেলের মধ্যেই এক-ধারে দেয়াল দিয়া যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ড স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—জেলের মধ্যে আর একটী জেল যেন।

যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ডে সিপাহী, ডাক্তার ও জেল-কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরের যাওয়া নিষেধ, উপায়ও নাই—গেটের দরজা বন্ধ করিয়া পাহারা সেখানে মোতায়েন থাকে। তা'ছাড়া আমরাও খারাপ চরিত্রের বন্দী, আমাদের গতিবিধি জেল-আইনে সীমাবদ্ধ। তবু আমরা সত্যাগ্রহীর আড্ডায় যাইতাম, তাঁ'রাও আসিতেন। একই জেল, দেয়ালের ব্যবধান ছিলনা, তাই যাতায়াত চলিতে পারিত।

কিন্তু গেটে পাহারা, দরজা বন্ধ, তদুপরি দেয়াল দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখা থাইসিস্‌-ওয়ার্ড, সেখানে গিয়া কেমন করিয়া দেখা করিব, ভাবনা হইল। সর্ব্বোপরি, আরমারী-রেইড মামলার আসামী, পাহারার কড়াকড়ি একটু বেশীই হইবে। ভাবনাটা, কাজেই, একটু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কার্য্য-কালে দেখিলাম, যত ভাবিয়াছিলাম, ততখানি না ভাবিলেও চলিত। সময়-কালে দরজা খোলা পাওয়া গেল। বেলা গোটা নয়-দশের সময় পরদিন অম্বিকা-বাবুর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখি, বিছানার উপর বসিয়া আছেন। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন—"বসুন।"

চেয়ার টানিয়া বসিলাম। শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম।

শুনিলাম, সরকার তাঁ'র বিচার স্থগিত রাখিয়াছেন, যদি সারিয়া সত্যই একদিন উঠেন তখন বিচার করা হইবে। অম্বিকা-বাবু নিজে জীবনের আশা রাখেন না। তাঁ'র ধারণা যে, আয়ু তাঁ'র প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া আমারও তাই মনে হইল। যদি এ-রোগ ও অবস্থা হইতে সারিয়া উঠেন, তবে সে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে।

কহিলাম—"জায়গাটা ভালো, আর rest-ও পাবেন, দেখবেন ভালো হ'য়ে উঠছেন।"

শান্তভাবে কহিলেন—"শেষে এই ভাবে রোগে ভুগে শেষ হওয়া! যদি মরতেই হয়, তবে এ-ভাবে নয়। ফাঁসি দিলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকত, কিন্তু ভালো না হয়ে উঠ্‌লে সে-সম্ভাবনা কই ?"

বুঝিলাম, রোগীর মৃত্যুতে তাঁ'র ঘৃণা রহিয়াছে, সারা মন দিয়া আজ একটী মাত্র জিনিষ তিনি কামনা করিতেছেন—তা' বিদ্রোহীর গৌরবজনক মৃত্যু।

কহিলাম—"আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি মারা গেছেন।"

হাসিয়া কহিলেন—"আত্মীয়েরাও তাই মনে ক'রে শ্রাদ্ধাদি কাজ সেরে রেখেছেন। সবাই মনে করেছেন যে, আমি মারা গেছি। এ-ভুল সরকারও করেছিল। বাঁচাটা সত্যই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়েছে। কেমন ক'রে বাঁচলাম তা'ই ভাবি।"

—"কেন, কি হয়েছিল ?"

উত্তরে যাহা বলিলেন এবং শরীরের যে-সব চিহ্ন দেখাইলেন, তা'তে বিস্মিত হইতে হয় যে, মৃত্যুর হাত তিনি এড়াইলেন কেমন

করিয়া। বাঁচাটা মস্ত একটা accident বলিয়াই আমার মনে হইল।

বুকে কালো কালো দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এগুলি কি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন—"কালশিটে।"

—"তা'তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেমন ক'রে হোল?"

—"বুটের পেরেকে, আর বন্দুকের কুঁদায়।"

চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"বুঝতে পারলেন না? আচ্ছা বল্‌ছি," বলিয়া হাঁটু ও উরুর কাপড় সরাইয়া দেখাইলেন, কালশিটে সব ছাইয়া আছে।

—"আরও আছে, দেখাতে পারলাম না। ধরা-পড়ার পর আক্রোশ মিটাবার জন্য বুট-পায়ে শরীরের উপর দিয়ে প্যারেড্‌ করেছে, বন্দুকের কুঁদাও ব্যবহৃত হয়েছে।—গলাদিয়ে রক্ত-পড়া সেই থেকেই শুরু হয়েছে।"

—"কারা? ইউরোপীয়ান-অফিসাররা করেছেন?"

—"তাঁ'রাও ভালো ব্যবহার করেন নি অবশ্য। কিন্তু এ-কীর্ত্তি কয়েকটি দেশী পুলিশ-কর্ম্মচারীর। অনেক সময়ই ভাবি, বাঙ্গালী হ'য়েও এ-রকম বিজাতীয় আক্রোশ তাঁ'দের আসে কি ক'রে, তাঁ'দের এ-মনোবৃত্তির হেতুই বা কি? অজ্ঞান হ'য়ে গেছি, তবু বুট-পায়ে সমান বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছেন। জঘন্য গালাগালির কথা নয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এ-ব্যবহার—আমি তো কারণ ভেবে পাইনা।"

চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। কিন্তু সে-দিন ভিতরে রক্তে যে

জ্বালা বোধ করিয়াছিলাম, আজও তা' মনে আছে। রক্তে কামড় লাগে—পোকায় যেন আগুনের বিষ ছড়ায়। মাথায় রক্ত চাপিলে মানুষের যে কি-খুনী চেহারা হয়, তা' কতকটা সেই দিন জানিতে পারিয়াছিলাম।

আজ আর মাথায় রক্ত উঠেনা, রাগও হয় না লজ্জা একটু হয়, তা'ও সাময়িক। স্বজাতীয়ের অধঃপতন ও চরিত্রহীনতায় লজ্জিত হই বটে—কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য সে-লজ্জা মনে থাকেনা। শুধু মনে ভাবনা গভীর হয় যে, আর কত নীচে নামিতে হইবে! যত ক্ষুদ্র ও হীন হওয়ার, তা'কি আমরা আজও হইতে পারি নাই? আর কত নামিব—উপরে উঠিবার আহ্বান-আসার সময় কবে আসিবে? মানুষের নিম্নতম পতনতো দীর্ঘদিনই দেখিলাম। মানুষের উচ্চতা কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এবার তা'র জন্য ডাক কি শুনিতে পাইব না? পাইলে, সে কবে?

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে-দিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। অম্বিকা-বাবুর নিকট যে-সব কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাই রাত্রি-বেলা একাকী পাইয়া মনের সামনে মূর্ত্তি ধরিয়া বার বার দেখা দিতে লাগিল।—

নিশীথ-রাত্রে অতর্কিতে অস্ত্রাগার-আক্রমণ ও লুণ্ঠন—চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেই চোখের সামনে সে-ইতিহাসের পুনরভিনয় হইতে দেখি। 'কা'দের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে', অন্ধকার আকাশে আগুন ধরানো হইয়াছে—চোখের সামনে এ-ছবি নিয়া ঘুমাইতে পারার মত নার্ভ সে-দিন আমার ছিলনা।

আজ প্রশ্ন মনে আসিতেছে—আকাশের সে-আগুন নিভানো হইয়াছে কিনা? কিম্বা, সে-আগুন ধীরে ধীরে সারা আকাশটা গ্রাস করিবে? রঞ্জিৎ-সিং নাকি বলিয়াছিলেন—"সব লাল হো যায়গা।" ইতিহাসের কি সত্যই পুনরাবৃত্তি হয়?—

অম্বিকা-বাবুর মুখে সে-দিনের শোনা দুটী সামান্য খবর এখানে উল্লেখ করিব।—

সহরের অবস্থা এখন শান্ত হইয়াছে, সমুদ্রে জাহাজ-বাস ত্যাগ করিয়া সাহেবদের পরিবারবর্গ সহরে আসিয়া আগের মত বসবাস করিতেছেন। সাহেবদের ছেলে-মেয়েরাও কাঁদে,—জানিনা কোন দুঃখে, এমনি এক ক্রন্দন-রত শিশুকে তা'র মা বা আয়া কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছিলনা। সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইলে এক বুড়ী মেম ছেলেটীর কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল—"Hush up Baby, Sing is coming."

সিং মানে অনন্ত-সিং। বেবি তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়াছিল। সিংয়ের নামে সাহেবদের দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা শান্ত হইত।

আমরাও একদিন 'বর্গী এল দেশে' শুনিয়া ঘুমাইতাম এবং পাড়া জুড়াইত। আচ্ছা, এমন কি কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, বেবিই শুধু ঘুমাইবে না, এ-দেশের নামে তা'র বয়স্ক বাবা-মারাও শান্ত হইবে, এ-পাড়াটা সত্যই জুড়াইবে! আজ যা' স্বপ্ন বলিয়া লাগে, আগামী-দিনে তাহা আর স্বপ্ন থাকে না, সত্য ও সম্ভব হইয়া দেখা দেয়—মানুষের ইতিহাসে এ-নজীরের তো অভাব নাই। সে ইতিহাসের এ-দেশে সত্য হইতে বাধা কি?

কয়েক মাস পরের ব্যাপার।—পলাতক বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সারা চট্টগ্রাম সৈন্যদের ছাউনী হইয়াছে। দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার ধাক্কায় গ্রামে গ্রামে 'ত্রাহি-ত্রাহি' ডাক উঠিয়াছে। বিপ্লবীদের মাথার দাম চড়িয়া গেল—কারু দশ-হাজার, কারু পাঁচ-হাজার, কারু বা হাজার টাকা। যে ঐ-মাথা ধরাইয়া দিতে পারিবে, মাথার উপরে নির্দ্ধারিত তঙ্কা তাহার প্রাপ্য হইবে।

এমন দিনে সন্ধ্যার পরে আশ্রয়ের জন্য অম্বিকা-বাবু এক গ্রামে আসেন, সঙ্গে দু'জন সঙ্গী। শরীর দুর্ব্বল, ক্ষত-চিহ্নগুলি তখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই, নিশ্চিত মৃত্যু হইতে কোন রকমে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন—শ্রান্ত হইয়া এক গৃহস্থের ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবেন—ঘরের বেড়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘরের মধ্যে মেয়েছেলের গলা শোনা যাইতেছিল। মনোযোগ করিতেই বুঝিতে পারিলেন যে, কে একজন লক্ষ্মীর পুঁথি পড়িতেছে। বিষ্যুৎবার, তাই গৃহস্থ-বধূদের লক্ষ্মীর ব্রত। পুঁথি শেষ হইল। বোধহয় এখন গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম চলিতেছে। (এমন সময় কানে আসিল কে একজন প্রার্থনা করিতেছেন—"মা লক্ষ্মী, অনন্ত সিংকে বাঁচিয়ে রাখ, সূর্য্য-সেনকে বাঁচিয়ে রাখ। মা, ওরা কেউ যেন ধরা না পড়ে।"—অম্বিকা-বাবুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ—ধন-ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিল না, অভাব-অভিযোগ জানাইল না, কিম্বা সুখ-শান্তি কোনটাই চাহিল না।

দেবতার নিকট তা'দের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল, যা'দের সে কোনদিন চোখে দেখে নাই, যা'দের চেনেনা জানেনা, শুধু যা'দের নাম ও কথা মাত্র শুনিয়াছে। তা'দের প্রাণের জন্য এর এ মমতা-বোধ কেন ?—

অম্বিকা-বাবুর ইচ্ছা হইল, ভিতরে গিয়া এদের একবার দেখিয়া আসেন। কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিলেন। পুলিশের লোকের কানে যদি কোনরকমে এ-খবরটা পৌঁছায়, তবে এ-বাটীর অধিবাসীদের দুর্গতির আর অবধি থাকিবেনা। সঙ্গী দু'জনকে সঙ্গে নিয়া তিনি আবার ধীরে ধীরে অন্ধকারে গ্রামের পথ ধরিলেন।

অবস্থাটা মন্দ নয়—নিজের দেশে রাত্র-অন্ধকারে লুকাইয়া ফিরিতে হয়, হিংস্র-শ্বাপদের মত দলে দলে ক্ষুধার্ত্ত বিদেশীরা সাঙ্গচর ঘুরিয়া ফিরিতেছে, অতর্কিতে ঘাড়ের উপর যে-কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া লাফাইয়া পড়িতে পারে। আর, অন্যদিকে গৃহ-দেবতার পায়ের তলায় একটী বেদনাতুর ক্রন্দন লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণ-ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। তবু গৃহে ফিরিয়া যাওয়া যাইতেছে না, ঐ শ্বাপদ-বেষ্টিত অন্ধকারেই লুকাইয়া ফিরিতে হইবে।

—ডেটিনিউ

সিউড়ী-জেলে এক সত্যাগ্রহী ভদ্রলোককে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জীবনে যে-কয়টী অদ্ভুত মানুষকে দেখিয়াছি—এই ভদ্রলোক তাহাদের একজন।

আমরা যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা যেন ঝাঁকের মাছ। একের সঙ্গে অপরের তেমন কোন পার্থক্য থাকে না, একটীকে ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেই বাদ-বাকী সমস্তকেই চেনা ও জানা হইয়া যায়। এই ভীড়ের মধ্যে যাহারা একটু স্বতন্ত্র বিশেষ, তাহারাই মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তখন মনে হয়, এই পুরাণো পৃথিবীতে যেন নূতন কিছু দেখিলাম। পুরাণো যত প্রয়োজনীয়ই হউক, অথবা যত গুণই তা'র থাকুক না কেন, মন কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত সেই অলব্ধ-নূতনের দিকেই অহরহ ঝুঁকিয়া থাকে; নূতনের সাক্ষাৎ পাইলে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া রহে, যতদিন না সে-নূতন ব্যবহারে ও অতি-পরিচয়ে পুরাণের দলে গিয়া পড়ে।

এই ভদ্রলোকের মধ্যে বিশেষ-কিছু আমি দেখিয়াছিলাম এবং তাহাকে নূতন-কিছু বলিয়াই আমার মন গ্রহণ করিয়াছিল। ভদ্র-

লোককে যে ভুলিতে পারি নাই, সে আমার কৃতিত্ব নয়, তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যেই মনে পাকা-পোক্ত জায়গা করিয়া লইয়াছেন।

ভদ্রলোকের নাম আমার মনে নাই, চেহারাটা মনে আছে। শঙ্করাচার্য্য নাকি বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপ দুইই মিথ্যা। আমি অতখানি যাইতে সাহস পাই নাই, অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত স্বীকার পাইতে পারি—অর্থাৎ নামটা মিথ্যা, এ-কথায় সায় দিতে পারি। জানি না, কোন দর্শন-শাস্ত্রে নাম ও রূপকে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা বলিয়া মানা হয় কি না। যদি মানা হয়, তবে তা'র ঘোরতর প্রতিবাদ এখানে করিয়া রাখা গেল।

কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িল, তখন আরও কিছুটা কথা যোগ করিতেছি—

নাম ও রূপ অচ্ছেদ্য নয়। অনেক সময় নামটা অতি চেনা লাগে, কিন্তু মুখ কিছুতেই মনে আসে না। তখন নামটা একটা ফ্রেমের মত শূন্যে ঝুলিতে থাকে, কোন মুখের ছবি সেখানে ফুটিয়া উঠে না—রূপহীন নিঃসঙ্গ-নাম কেবল ভাসিয়া চলে, কোন রূপের কিনারায় গিয়া ঠেকে না।

আবার এর উল্টাটিও হয়—যেমন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে। মুখগুলি মনের সামনে পরিষ্কার আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু আসিবার কালে যুক্তি করিয়া নামগুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। চেনা-মুখ, জানা-মুখ —কিন্তু, কিছুতেই-তো নাম মনে আসিতে চায় না। তখন খোঁজা-খুঁজি পড়িয়া যায়, স্মৃতির রাস্তায় মন ছুটিয়া চলে, কোথায় পথের ধারে নামটা পড়িয়া আছে তুলিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু বৃথা খোঁজা, যাহা নাই তাহা নাই। নামহীন-রূপ নগ্ন বিবসন মূর্ত্তি

নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যেন বৃন্তহীন পুষ্প চোখের সামনে ফুটিয়া

মানুষের মন, কখনও নাম ফেলিয়া দিয়া মুখটা মনে রাখে; আবার কখনও নামটা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে, মুখটা পিছলাইয়া কোথায় অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে। মোটকথা, মানুষ মনেও যেমন রাখে, আবার ভোলেও তেমনি। কাজেই, অর্দ্ধেক-মনে-রাখা ও অর্দ্ধেক-ভোলা জিনিষে মিলাইয়া সে একটা অর্দ্ধ-নারীশ্বর গোছের কিছু সৃষ্টি করিয়া লয়।—এর পরেও যিনি বলিবেন যে, নাম ও রূপ অচ্ছেদ্য, তিনি আস্ত একটা কুতার্কিক।

এই ভদ্রলোকের একটীমাত্র পরিচয় আমি জানি—তিনি সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে আসিয়াছেন। বাহিরে তিনি কি করিতেন, সে খবর আমি রাখি না। তিনি উকীল হইতে পারেন, ডাক্তার হইতে পারেন, স্কুল-মাষ্টার হইতে পারেন, ব্যবসাদারও হইতে পারেন—সংক্ষেপে, তিনি সব কিছুই হইতে পারেন, কিম্বা আদতে কিছু নাও হইতে পারেন। হয়তো-বা কর্ম্মহীন ও উদ্দেশ্য-শূন্য জীবন কাটাইতে-ছিলেন, হাতের ধারে দেশ-স্বাধীন-করার কাজটা পাইয়া ঝোঁকের মাথায় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

প্রথমদিনে ভদ্রলোককে যে-ভাবে দেখি, তা'তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে লোভ হয় যে—সে যেন একটী আবির্ভাব।

ভোরের টিফিন-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, যে যাহার দিনের কাজে সবেমাত্র মন নিবেশ করিয়াছে। রুমের মধ্যস্থানে টেবিলের উপর ক্যারম-বোর্ড রাখিয়া ধনেশ-ভট্টাচার্য্য ও কেষ্ট-চক্রবর্ত্তী দুই পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাশে

দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিলাম। ধনেশ-বাবু মারাত্মক খেলোয়াড়, হাতে 'ষ্ট্রাইকার' গেলে সব গুটি গর্ত্তে নিয়া তবে থামেন। কেষ্ট-বাবু খেলার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাহিতেছিলেন—'আমারে ডাক দিলে হায় (এইখানে ঝোঁক দিতে হইবে) চোখ-ইসারায় (২য় ঝোঁক) কে গো দরদী (৩য় ঝোঁক)।' ওস্তাদ গাইয়ে সুরের বিস্তার করে, কেষ্ট-বাবুও কথার বিস্তার গাহিয়া দেখাইতেছিলেন—'হে দরদী, তুমি কেগো, তোমার দরদে যে সন্দেহ হয়। ডাক দিলে, তা' ভালোই করেছ, কিন্তু সোজাসুজি ডাকলে না কেন? চোখ-ইসারায় ডাক দিলে—উহুঁ, তোমার মতলবতো মোটেই ভালো না, তোমার স্বভাব-চরিত্তিরও কি তবে ভালো না, ওগো দরদী-ঈ-ঈ ঈ—।'

মুগ্ধ হইয়া ধনেশ-ভট্টাচার্য্যের খেলা ও কেষ্ট-চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতেছিলাম। কেষ্ট-বাবুর হুঁস ছিল না যে, তাঁহার নূতন-চালের গান শুনিয়া ও-পাশের 'সীটে' মাখম-বাবু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্য করিতেছেন।

এমন সময় কানে আসিল—'May I come in?'

দরজার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিলাম—এক মূর্ত্তি। জাইঙ্গা-পরা গোলগাল খাটো এক ভদ্রলোক একগাল দাড়ি লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছেন।

আমরা কিছু বলিবার আগে তিনি নিজেই অনুমতি দিলেন—'Oh yes come in'—বলিয়া 'রাইট্-লেফ্‌ট্-রাইট্'-মার্চ্চের তালে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোককে ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ মিলিল। খালি

গা, গোলগাল চেহারা, লোমে সর্ব্ব-শরীর আবৃত, দেখিয়াই মন ডাক ছাড়িয়া উঠে—'বাবা, এ যে দেখ্‌ছি আমাদের সেই লোমশ-মুনি—আধুনিক ভাষায় নালিমি-কম্বল।' গলায় পৈতা ঝুলিতেছে, হুঁকা দিবার সময় আর কষ্ট করিয়া জাত জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। চোখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তা' আয়তনে ক্ষুদ্র, ভ্রূ আর একটু ঝুলিয়া নামিয়া আসিলেই চোখ দু'টাকে ঢাকিতে পারিত। একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, চোখে তাঁহার পলক পড়ে না, পড়িলেও অতি কম। এ-রকম স্থির দৃষ্টি স্বাভাবিক মানুষের থাকে না।

ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া কেষ্ট-চক্রবর্ত্তী তাহার সঙ্গীত থামাইয়া কহিলেন—"আসুন।"

তিনি উত্তর করিলেন—"এসেছি। কি ছাই খেলেন! গর্ত্তেই যদি নিতে হয়, এত হাঙ্গামার দরকার কি? হাত দিয়ে ওগুলোকে জড় করে গর্ত্তে ঠেলে দেন না কেন?"

তারপর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বুঝি সেদিন এলেন?

মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম।

কেষ্ট-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনারা মোটমাট ক'জন হলেন?"

—"চোদ্দজন।"

—"চোদ্দ? বেশ—একের পিঠে চার চোদ্দ—সোনার কোট ভ'রে ওঠ।"

আমরা হাসিয়া ফেলিলাম। তিনি কিন্তু হাসিলেন না, ধীরে ধীরে মাথম-বাবুর সীটে গিয়া বসিলেন।

প্রথম দিনেই ভাব-ভঙ্গী ও কথা-বার্ত্তা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, ভদ্রলোকের মাথায় ছিট্ আছে।

এর কিছুদিন পরের ব্যাপার।—

জেলখানাতে আমাদের সপ্তাহে সাতটাই রবিবার। দিনকে টানিয়া রাত্র দেড়টা-দু'টা পর্য্যন্ত লম্বা করিয়া লইয়া আমরা জাগিতে পারিতাম, আবার রাত্রিকেও ঘুমে-ঘুমে দিনের অনেক খানি পর্য্যন্ত আগাইয়া আনিতেও পারিতাম। আমাদের দিন-রাত্রির বিভাগ আর দশজনের মত ছিল না।

সে-দিন বেলা হইয়া গেলেও বিছানা ছাড়িয়া উঠি নাই। মশারির মধ্যে থাকিয়াই দিনের অগ্র-গতি ও উন্নতির আভাষ পাইতে-ছিলাম। টিফিন্ সমাধা করিয়া চায়ের পেয়ালা ঠুন্‌ঠুন্ বাজাইয়া বাবুরা শেষ করিয়াছেন—তা'ও তন্দ্রার মধ্যেই এক ফাঁকে চেতনায় জানা হইয়া গিয়াছিল। ধনেশ-ভট্টাচার্য্য ও তাঁ'র প্রতিপক্ষ কেষ্ট-চক্রবর্ত্তী ক্যারম-যুদ্ধে নামিয়াছেন—ঠকাঠক শব্দে তা' প্রচারিত হইতেছিল। ও-কোনার ধারে বাক্-যুদ্ধ চলিতেছিল, যোদ্ধা শচীশ-সরকার ও সন্তোষ-গাঙ্গুলী। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি শব্দ মাঝে মাঝে যুদ্ধের আসর হইতে এ-দিকেও ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িতেছিল। বুঝিলাম, সাহিত্য নিয়া এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বাধিয়াছে। আমার পাশের খাটে নারয়ণ-চক্রবর্ত্তী গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন—তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের উপর যেন কোথা হইতে টুপ্-টাপ্ করিয়া শিশিরে-ভেজা শিউলীফুল আলগোছে আসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বিপরীত দিকের খাটে

ম্যানেজার জুমু-মজুমদার বাজারের খাতা লিখিতেছেন, তাঁ'র গলা শোনা যাইতেছে—"কারু কিছু আনতে হবে নাকি, খাতা কিন্তু চ'লে গেল।"

—"এক বাক্স বর্ম্মা-চুরুট লিখে দিন।" কোথা হইতে এ-অনুরোধ বাতাসে উড়িতে উড়িতে এ-ধারে আসিয়া ঝরা-পালকের মত নামিয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম। সমস্ত ঘরটার শূন্য ভরিয়া নানা-রকম শব্দ, কথা-বার্ত্তা যাতায়াত করিতেছিল। তা'দের ছায়া আমার মনের তন্দ্রার পাতলা পর্দ্দার উপর আঁকা-বাঁকা রেখা-পাত করিতে-ছিল। শূন্য-পথে যেন নানা পোষাকের অসংখ্য শব্দের মিছিল চলিয়াছে—আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগা চেতনা ল'ইয়া বিছানায় তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

হঠাৎ সমস্ত চুপ হইয়া গেল—কে যেন সুইচ্ টিপিয়া দিয়াছে, তাই শব্দ নিভিয়া গিয়াছে। মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন একটা আকস্মিক নীরবতা আসিয়া ঢুকিয়াছে। মনের উপর হইতে হেঁচ্কা-টানে তন্দ্রার পাতলা চাদরটা সরিয়া গেল।

ব্যাপারটা কি, বুঝিবার জন্য চোখ মেলিবার আগেই অপরিচিত গলা শুনিতে পাইলাম—'জাগো, মুসাফির।'—

চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একদল সত্যাগ্রহী। আরও একদল দরজার কাছে আসিয়াছেন, এখনও ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই, তবে ঢুকিলেন বলিয়া।

আর এ-দিকে আমার খাটের সামনেই ঘরের মধ্যে সেই ভদ্র-লোক। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, মশারিটা তুলিয়া চাঁদোয়া

করিয়া রাখিলাম। কাণ্ড দেখিয়া দু'চোখ আমার বিস্ময়ে যেন হাঁ করিয়া রহিল—ভদ্রলোক নৃত্য-সম্বলিত গান গাহিতেছেন!

তিনি জেলের একখানি কম্বল বাউলের আলখাল্লার মত করিয়া পরিধান করিয়াছেন। ক্রুকবণ্ড-চায়ের বড় একটা কৌটা কিছু বাখারি ও তারের সংযোগে বাউলের একতারা হইয়াছে, সেটাকে একহাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান গাহিতেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন অপূর্ব্ব, একবার এ-পা আবার ও-পা তুলিয়া নৃত্যও তেমনি অনবদ্য। সাজ-পোষাকে কোন খুঁত ধরিবার ছিল না। এর সঙ্গে কর্কশ মোটা গলায় গান, তা'রও সৌন্দর্য্যের অবধি ছিল না, স্বর্গীয় বলিলেই চলে। গানের পদ আজ আর মনে নাই, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভাবটুকু মনে আছে।

তিনি গাহিতেছিলেন—

'হে মুসাফির, আর কত ঘুমাইবে? এখন জাগো। অনেক দূর যে যাইতে হইবে, সে-খেয়াল নাই নাকি? নেও, উঠ—আর দেরী করিও না, জাগিয়া পড়, গাঁঠরী বাঁধ এবং পথে নাম, হে মুসাফির।'

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়াই আছি—গানও থামিতেছে না, ঊর্দ্ধ-বাহু নৃত্যও বিরাম হইতেছে না, গান ও নাচ দুইই সমান চলিয়াছে।

এক সময়ে তিনি গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেলেন এবং সত্যাগ্রহীর দলও অধিকাংশই তাঁ'র পিছনে পিছনে গেল।

শিক্ষিত ও বয়স্ক ভদ্রলোকের এই কাণ্ড দেখিয়া আজও আবার মনে হইল যে, নিশ্চয় এ পাগল, কিম্বা এর মাথায় ছিট্ আছে।

কিন্তু স্বীকার পাইতে হইল যে, ইনি একাই সত্যাগ্রহীর আসর

মাতাইয়া রাখিয়াছেন, জেলের কষ্ট মনে বোঝা হইয়া জমিতে দিতেছেন না এবং হাসি ও আনন্দের হাওয়ায় একাই সব-মনের মেঘ উড়াইয়া খেদাইয়া ফিরিতেছেন। ইনি পাগল হউন ক্ষতি নাই, কিন্তু জেল-জীবনে সঙ্গী ও সাথী-হিসাবে এর দাম পরিমাপ হয় না।

ভদ্রলোকের এ-জাতীয় বিচিত্র আনন্দ-আক্রমণ প্রায়ই হইত। তিনি আসিলেই আমরা তৈরী হইয়া উঠিতাম, মনের অঞ্জলি পাতিয়া অপেক্ষা করিতাম, না জানি কোন নূতন রসের পানীয় পরিবেষণ চলিবে। ভদ্রলোক আমাদিগকে লোভী বানাইয়া তুলিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরের ব্যাপার।—

দুপুরে দিবা-নিদ্রা উপভোগ করিয়া লইয়াছি। টিফিনও শেষ করিয়াছি। হাতে আর তখন জরুরী অবশ্য-কর্ত্তব্য কিছু ছিল না। জটলা করিয়া লোহার খাটে বসিয়া নানা কথা-বার্ত্তায় আমরা ব্যাপৃত ছিলাম। দু'মিনিট দাড়াইয়া শুনিলে চমক লাগিয়া যাইবে যে, এক আসরে কত হরেক-রকমের আলোচনা চলিতে পারে। এমন বিষয় ছিল না, যা' নিয়া আমরা দু'কথা না-কহিতে পারিতাম। কোন কিছু না-জানার মস্ত সুবিধাই এই যে, সব-কিছু নিয়াই দ্বিধাহীন আলোচনা ও মন্তব্য করা যাইতে পারে। নতুবা, আমরা পাতঞ্জল-দর্শন নিয়াও গম্ভীর আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, কে বিশ্বাস করিবে। অবশ্য, প্রকারান্তরে একথা বলি না যে, আমরা সর্ব্বশাস্ত্র-পারঙ্গম হইয়াছিলাম। আর বলিলে কে-ই বা বিশ্বাস করিবে—দেশ যে নাস্তিকে-ভরা।

আলোচনা হইতেছিল যে, মরিলে প্রাণ থাকে কিনা। বিষয়টা অতীব দুরূহ, তাই মীমাংসা হইতেছিল না। কেষ্ট-বাবু কহিতে

চাহিতেছিলেন—"মরার পর আবার মানুষ থাকে কেমন ক'রে? তবে মরার কি অর্থ হয়? মরলেই তো সব শেষ।"

সন্তোষ-বাবু কহিলেন—"না, সব শেষ নয়। মরার পর অনেকে ভূত হ'য়ে টিকে থাকে।"

কেষ্ট-বাবু চটিয়া গেলেন—"আপনি ভূত দেখেছেন যে ভূতের কথা বলছেন?"

—"দেখেছি কি, আলাপ পর্য্যন্ত করছি।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

কেষ্ট-চক্রবর্ত্তী হটিবার পাত্র নহেন, তপ্ত হইয়া কহিলেন—"আপনি একটী অদ্ভুত, আপনি কিম্ভূত।"

তত্ত্ব-আলোচনা হাতা-হাতিতে গিয়া না দাঁড়ায়, আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু দৈব আমাদের রক্ষা করিলেন।

দেখিলাম, আমাদের আসরের সামনে ঘোমটা মাথায় কে দাঁড়াইয়া। এ-মূর্ত্তি কি আর ভুল হইবার! আজ আর ভদ্রলোক একপাল সত্যাগ্রহীকে 'ফলো-মি' বলিয়া পিছনে টানিয়া আনেন নাই, একাই আসিয়া ঢুকিয়াছেন।

পরিধানে জেলের জাইঙ্গা, অথচ একটা চাদরে মাথায় ঘোমটা দিয়া আসিয়াছেন। ব্যাপারটা আমরা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তাই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় মেয়েলী-কণ্ঠে হুকুম আসিল—"দুর্গের দরজা বন্ধ কর।"

বুঝিলাম, দাড়ি-গোঁফ যা' দেখিতেছি, তা' সব মিথ্যা—ঐ-ঘোমটাই খাঁটি। তা' নয় বুঝিলাম, কিন্তু কে এই বীর্য্যময়ী ঈষৎ-

অবগুণ্ঠিতা রমণী! এবং কোন্ দুর্গের দরজাই বা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন!—চিন্তা নিয়া আমরা শূন্যে ঝুলিতে লাগিলাম।

আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল—"কে? মহারাজা যশোবন্ত-সিংহ আসিয়াছেন? না—মিথ্যা কথা। এ মহারাজা যশোবন্ত-সিংহ নন। আমার স্বামী হয় যুদ্ধে মরেন, নয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নন। যাও, দরজা বন্ধ কর।"

হতভাগ্য যশোবন্ত-সিংহ, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি সিংহীর থাবার তলে পড়িয়াছ দেখিতেছি।

ঘোমটা নামিয়া গেল, দেখা দিলেন যশোবন্ত-সিংহ। পুরুষের গলা শোনা গেল; কত অনুনয় করিলেন, কাঁদ-কাঁদ হইয়া প্রায় পায়ে ধরিলেন। কিন্তু মহামায়া পাষাণী, স্বামী বলিয়া স্বীকার পাইবেন না, কিম্বা দুর্গেও ঢুকিতে দিবেন না।

মহারাজা যশোবন্ত-সিংহ শেষটা খেপিয়া গেলেন। শত হউক, পুরুষ মানুষ তো! নিজের স্ত্রীর এ-ব্যবহার! কাহাতক আর সহ্য করা যায়। ক্ষত্রিয়-রক্ত টগ্-বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। কাল্পনিক-তরোয়ালের মুঠাটাকে শক্ত আঙুলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"বেশ, তবে তা'ই হউক। আমি চলিলাম। হয় যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিব, নয়, এই শেষ।"

বলিয়াই সামরিক-কায়দায় আবর্ত্তন এবং দীর্ঘ ও দৃঢ় পদ-ক্ষেপে নিষ্ক্রমণ। ঘোম্টা তুলিয়া লইয়া মহামায়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি মেয়েমানুষ, বাবা! এর চেয়ে পাথরও যে নরম। নিজের একমাত্র স্বামী, এত কাঁদাকাটি, এত অনুনয়-বিনয়, চোখের জল—কিছুতেই এ-মেয়েমানুষকে কায়দা করা গেল না, কাহিল বা নরম হইবার ধাতুই নয়। আবদার ধরিলেন—যুদ্ধে যদি জয় না হয়, তবে সেখানে গিয়া মরিতে হইবে। স্ত্রীর কাছে হয় যুদ্ধ-জয় করিয়া ফিরিতে হইবে, নয় যুদ্ধে মরিয়া ফিরিতে হইবে। তবেই স্ত্রী পুরুষ ও স্বামী বলিয়া স্বীকার পাইবেন। ধন্য তুমি বীর্যময়ী ক্ষত্রিয়-ললনা! তুমি আদতেই একটী আস্ত সিঙ্গী।

হঠাৎ আর এক সিঙ্গীর কথা মনে পড়িল। এই ক্ষেত্রেই তিনি হাজার বছর আগে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও ক্ষত্রিয়-কন্যা ছিলেন। বনের মধ্যে পাঁচ স্বামীর সম্মুখে বসিয়া থাবাতে, মানে জিভে বিষ ছড়াইতেছেন। ভীমকে চাঙ্গা করিতে পুরা একটা থাবার আঁচড়ও দরকার হইল না। যত বিপদ ঐ বড় স্বামীটাকে নিয়া। তিনি কিছুতেই উত্তেজিত হইবেন না, এমনই তাঁ'র ধনুক-ভাঙ্গা জেদ। যুধিষ্ঠিরের শরীরে বোধ হয় বেলেমাছের রক্ত—নইলে সে-দিন সে-ক্ষত্রিয় মেয়েটার মুখ দিয়া যে-সব কথা বাহির হইয়াছিল, তা'তে মানুষের রক্ত হইলে জ্বলিয়া উঠিত।

কোন-রকমেই যখন বড়-কর্ত্তাকে কাবু করা গেলনা, তখন স্ত্রীটি মোক্ষম অস্ত্র ছাড়িলেন, মানে কান্না জুড়িয়া দিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া সে কী কান্না, আর বক্তব্য ও ভাষারই বা কী গাঁথুনী।—একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা স্বামী উপস্থিত, রাজার মেয়ে, রাজার বৌ, তা'কে প্রকাশ্য রাজ-সভায় বিবস্ত্রা করিয়া অপমান করিল, চোখ মেলিয়া দেখিয়াও যা'রা প্রতিবাদ করিলনা, তা'দের হাতেই পিতা

তা'কে দিয়াছেন, অদৃষ্টের এ-দুঃখ, ভগবান যদি ডাকিয়া না নেন, তবে যে আর সহ্য হয়না, এখন মরণই ভালো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু যুধিষ্ঠির কম নাছোড়-বান্দা নন। ভীম তো দাঁত কড়মড় সুরু করিয়া দিয়াছে, গরম নিশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতেছে—যেন ক্রুদ্ধ সাপ ফুঁসিতেছে। আর যুধিষ্ঠির, সেই যে হাঁটুর উপর পা তুলিয়া লইয়া যুৎ হইয়া বসিয়াছেন, কথাটী পর্য্যন্ত বলিতেছেননা। তিনি যেন বড় মজা দেখিতেছেন, এমনই ভাবে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ কান্না শুনিতে পাইলাম। এঁ্যা—যুধিষ্ঠিরও কাঁদে নাকি? ওঃ-না, আমাদের সামনে-দাঁড়ানো মহামায়া ঘোমটার তলে কাঁদিতেছেন। তবে এ-দিকের সিংহীও নরম হইয়া আসিয়াছেন। কাঁদিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ করিতেছেন—এত সৌভাগ্য যদি দিতে পারিলে, তবে সুখ দিলেনা কেন? কেন ক্ষত্রিয়-কন্যা করিয়া কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলে? ইত্যাদি।

কথাটা মনে হইতেই শিহরিয়া উঠিলাম। —যাক্ ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। নিরীহ-বাঙ্গালীর পরিবারের মধ্যে যদি এ-জাতীয় দু'-একটী সিঙ্গী লেলাইয়া দিতেন—ভাবিতেও বুক শুকাইয়া উঠে। বাঙ্গালীদের উপর ঈশ্বরের দয়া আছে, বুক-ভরা-মধু বঙ্গের বধূরাই থাক্, ও-সব ভীষণ সিংহী-ব্যাঘ্রী কি আমাদের পোষায়।

কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়া প্রস্থান করিলেন। ঘোমটা ফেলিয়া খালি গায়ে আমাদের লোমশ-মুনি ফিরিয়া আসিলেন।

কহিলেন—"একটু তামাক খান দিকি।"

মাখম-বাবু ডাকিয়া কহিলেন—"বসন্ত, তামাক দিয়ে যা।"

বসন্ত পাশে দাঁড়াইয়াই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তামাক লইয়া

ফিরিয়া আসিল। ভদ্রলোক গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া লইয়া আরাম করিয়া টানিতে লাগিলেন এবং মুখ-ভরা ধোঁয়া চক্ষু অর্দ্ধেক বন্ধ রাখিয়া ছাড়িতে লাগিলেন। চাহিয়া চাহিয়া সেই পুরাণো কথাটাই আবার মনে আসিল—ভদ্রলোক পাগল নয় তো?

কিন্তু ভদ্রলোক পাগল ছিলেন না। সিউড়ী ছাড়িয়া আসার কয়েকদিন আগে ভদ্রলোককে ভালো করিয়া জানার সুযোগ হইয়াছিল।

বৈকালের দিকে ইঁদারার সেই চত্বরের উপর কয়েকজনে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভদ্রলোকটী আমাদের ওখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে সেদিন তাঁ'র একটা লম্বা কোট ছিল, পরিধানে অবশ্য খাটো জাইঙ্গা। আমাদের দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বসিতে বলিলাম, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

হাল্‌কা কথা-বার্ত্তা এক সময়ে যে কেমন করিয়া গুরুতর আলোচনায় পরিণত হইল, আমাদের খেয়াল ছিলনা! হিংসা ও অহিংসা-নীতি নিয়া দুই পক্ষের কথা কাটা-কাটি চলিতেছিল। বন্ধুদের মধ্যে কে একজন ঠাট্টার সুরে অহিংসাকে আক্রমণ করিলেন। বৈষ্ণব, বৈরাগী, খড়ম-পূজা ইত্যাদি শব্দ মর্ম্ম-পীড়াদায়ক অর্থে ভরিয়া ব্যবহার করিলেন। শুনিয়া এই পাগল ভদ্রলোকের চোখ অন্য-রকম হইয়া গেল।

তারপর তিনি যে-ভাবে কথা-বার্ত্তা কহিলেন, তা'তে বিস্মিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, তিনি যেন inspired হইয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, সে-বক্তব্যের সমস্ত মনে নাই,

কিছুটা মনে আছে। আর মনে আছে তাঁর দ্বিধা-হীন কুণ্ঠা-শূন্য বলার ভঙ্গীটি।

তিনি বলিয়াছিলেন, যে-কথা বহুবার বহু মানুষে বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, যে—মানুষের মধ্যে প্রাণীই সবটুকু নয়। যে বাঁচে, সেই প্রাণ-ধর্ম্মী পশুই একমাত্র নয়। তা'র মধ্যে আর একটা ভিন্ন-ধর্ম্মী অংশ বা অস্তিত্ব আছে, যা' জীব-জগতে তা'র অন্যান্য সরীকের নাই। সে হইল মানুষের অমর অস্তিত্ব—যেখানে তা'র সত্য-সন্ধান, সত্য-উপলব্ধি, সৌন্দর্য্য ও মূল্য-বোধ, ন্যায় ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি। যখনই পশুর স্বভাবকে সে একমাত্র সম্বল ও আশ্রয় বলিয়া মানিয়াছে, তখনই তা'র মহৎ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। অতীতের সভ্যতা এই পশুর-পথ ধরিয়াই মরিয়াছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে দেবতার অসীম শক্তি ও অস্ত্র দিয়াছে, কিন্তু দেবত্ব দিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের সে-শক্তি মানুষের ভিতরকার পশুটার হাতে পড়িয়াছে, সে-ই তা' ব্যবহার করিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতাও তা'র অগ্র-গামীদের পথ ধরিয়া সর্ব্বনাশের সামনে আসিয়াছে, একই পরিণামে গিয়া তা'কে শেষ হইতে হইবে, যদি না সে মানুষের সত্য-অর্থ জীবনে স্বীকার পায় এবং সামাজিক জীবনে তা' কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থার মধ্যেও মানুষের ভিতর মহা-মানুষ আসেন, তাঁ'রা হতাশ হননা, ভরসা হারাননা। প্রতিকূল অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে মানুষের পথ তাঁ'রা দেখান, সে-দিকে চালিত করেন। সে-পথ এই অহিংসার পথ, প্রেমের পথ—ভিতরে যে-অন্তর্য্যামী পুরুষ আছেন, তাঁ'র পথ। গান্ধী বুদ্ধ ও যীশুরই নূতন মূর্ত্তি এ বিংশ-শতাব্দীতে। ইত্যাদির পরে কহিলেন—"যে-মানুষ একাকী

নিজের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ করেছে, সেই জানে যে, গভীরে নেমে গেলে কেন প্রেম-করুণার উৎসের মুখ খুলে যায়, মানুষের সঙ্গে কেন তখন অন্য ব্যবহার মিথ্যা ও অসম্ভব বলে বোধ হয়।"

হিংসাও অহিংসার মীমাংসা এই এক আসরেই শেষ হইবার নয়, এ আমি জানিতাম। এও জানিতাম যে, দুই পক্ষেরই যথেষ্ট বলিবার আছে। হিংসারও একটা 'ফিলজফি' আছে এবং সে যে অহিংসার চাইতে কম জোরালো তা' নয়। মানুষের খাঁটি টেকসই পরিচয় কি, কোন নীতিতে নির্ভর করিলে সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান হয়, এ নিয়া অতীতে বহু মনীষি চিন্তা করিয়াছেন, বর্ত্তমানেও করিতেছেন। মানুষের জীবন-আকাশে অনন্ত জিজ্ঞাসার মতই এ-প্রশ্ন জ্বলিতেছে।—বৈকালের এই এক বৈঠকে সে-প্রশ্নের উত্তর আমি প্রত্যাশা করি নাই।

আরও একটা কথা, এই জাতীয় আলোচনার কালে আমি মনে রাখিতে চেষ্টা করি যে, সকল বস্তুকেই তা'র ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে সরাইয়া একটা বড় পট-ভূমিকায় নিয়া দেখা দরকার, নতুবা বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না। দেখার এ-কৌশল আয়ত্তে না থাকিলে কথা শুধু কথাই থাকিয়া যায়, অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তা' পণ্ড-শ্রমের বেশী কিছু হয়না।

ঘটনা ও বস্তুর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে অনন্তকালের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনায়াসে যাতায়াতের গোপন-পথ ইনি জানিবেন, এতবড় আশা এ-ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমি রাখি নাই। কারণ, দেশে

ও কালে কদাচিৎ এ-জাতীয় সন্ধানী পথচারী আসিয়া থাকেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম অন্য কারণে।

মহাপুরুষের প্রতি এর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এত অকৃত্রিম ছিল যে, সত্যই তা' আশ্চর্য্য-কিছুর মত আসিয়া আমাদের লাগিয়াছিল।

তিনি এক সময়ে যখন প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— "আপনারা কি তবে বলতে চান যে, বুদ্ধ-যীশু এঁরা মানুষ ঠকাবার জন্য এসেছিলেন? কতগুলি মিথ্যা কথা দিয়ে যাবার জন্যে এত কষ্ট করলেন?" তখন এঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি থতমত খাইতে দেখিয়াছি।

ভদ্রলোক যুক্তিকে বিশ্বাস দিয়া ঠেকাইতেছেন, এ জানিয়াও আমার বন্ধুদের সে-দিন বিচলিত হইতে হইয়াছিল। এ-বিশ্বাসের জোর যে কত অমোঘ, সে-সন্দেহ আমাদের কাহারও ছিল না। এত জোরালো বিশ্বাস পাগলের থাকে না, কিম্বা থাকিলে হয়তো শুধু পাগলেরই থাকে।

নিজের জীবনে, অনেক বন্ধু-বান্ধবেরও, দেখিয়াছি যে, আমাদের বিশ্বাসের জোর কত কম। যুদ্ধে তাই পরাস্ত হই, কিম্বা মাঝপথে কাজ ও সঙ্কল্প ছাড়িয়া দেই। নিজের চরিত্রে এ-ত্রুটি আছে, তাই ভদ্র-লোকের কথা ভুলিতে পারি নাই। যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই একটি অকপট সরল-বিশ্বাসের ছবি দৃঢ় ভঙ্গিমায় চোখের সামনে খাড়া হইয়া উঠে দেখিয়াছি।

আজ সত্যই পরিষ্কার দেখিতে পাই—অসীম সমুদ্রে ঢেউয়ের মত মানুষ উঠিতেছে, আবার নামিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্তই জলে জল-ময়, শুধু একটী পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া জাগিয়া আছে। মৃত্যু-

সমুদ্রের ঢেউ আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তা'কে জলে ডুবাইতে পারেনা, বিচলিত করিতে পারেনা, কিম্বা ক্ষয়ও করিতে না—মৃত্যু-জয়ী এ-বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস অজানা সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভের মত খাড়া হইয়া আছে—জীবন-পোতগুলির দিক-নির্ণয়ের সাহায্যের জন্য। এ যেন সৃষ্টির নিজের কাছে নিজেরই মাভৈঃ-আশ্বাস। বুদ্ধিতে নয়, প্রতিভাতে নয়, অদম্য-চেষ্টাতেও নয়—এই বিশ্বাসের জোরেই মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। মানুষের সমস্যাগুলির সমাধানের অন্য-পথ নাই। বিশ্বাস হারাইলে মানুষের বুদ্ধি অন্ধ হইয়া যাইত, সৃষ্টির আলোই নিভিত।

কেবলই আজ মনে জিজ্ঞাসা আসিতেছে যে—আমাদের মধ্যে মানুষ কই, যার বিশ্বাসের সম্মুখে পাহাড় পর্য্যন্ত টলিয়া যাইবে এবং মানুষের মুক্তির রাস্তা উন্মুক্ত হইবে। মানুষকে সে-বিশ্বাস কি কেউ আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিবেনা?

ক মাস আগে সে-দিন এ-লেখা আরম্ভ করিবার সময় বলিয়াছিলাম—'বাহির কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।'

টা দু'দিক দিয়া সত্য ছিল। জেলের বাহির দরজায় সেই যে ঢুকিবার সময় পড়িয়াছে, এই এতদিন তাহা সমান ভাবেই আবদ্ধ আছে, শুধু নূতন আগন্তুকের প্রবেশের পথ খোলা।

জের দিক দিয়াও কথাটা সত্য ছিল। কোন সম্মুখ বা বাহির মনের সামনে ছিলনা। একটা দিনকেই বছরের পর বছর আবৃত্তির মত যাপন করিয়া । তাই লোভ হইয়াছিল নিজের ভিতরে প্রবেশ করিবার। যাহা দেখিব তাহা ভার কলমের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। নিজেকে এইভাবে নিজের জানাও বিধ্যাও দেওয়া হইবে ভাবিয়াছিলাম।

আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া শুধু স্মৃতির জাবর কাটিয়াছি এই লেখায়। মনের শবে নূতন দেশ আবিষ্কার করার কথা, নিজের সত্য-পরিচয় জানা এ-সব রাখিতে পারি নাই।

এখন আর সে-সময় নাই। আজ ভিতর দুয়ারে কপাট পড়িল, বাহির জা খুলিবার শব্দ শুনিতেছি। আগামী-কাল জেল হইতে আমাকে বাহির বে, চলন-বিলের ধারে কোন এক গ্রামে অন্তরীণ হইবার হুকুম নাকি াছে। যে-মন কলম লইয়া আমার সাথে সাথে ছিল, এ-খবরে সে সরিয়া াছে, তা'র আর দেখা পাইতেছি না। ভিতর আমাকে ছাড়িয়া দিল, বাহিরের কারে গিয়া পড়িবার প্রতীক্ষায় এখন আছি।

এবারকার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলির এতগুলি দিন জেলখানার হাতে রা[illegible] গেলাম। ছাড়িয়া যাইতে বড় মনে লাগে। এ-দিনগুলির উদ্ধার কি কোন[illegible] সম্ভব নহে? "জীবনের ধন কিছুই যায়না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক্ অ[illegible] —এ- কথা সত্য না মিথ্যা?

বড় শুরু করিতেছে বাহিরে যাইতে। অপরিচিত পৃথিবী, জল ও ছায়ার আ[illegible] মরুভূমির তপ্ত শুষ্ক ছবি কেবল চোখের সামনে দেখি কেন? এ কী নির্মম ও[illegible] ভবিষ্যৎ আজ আমাকে সম্মুখে ডাকিতেছে? ভিতরটা আজ আমার বড়ই[illegible] একদিকে।

অন্যদিকে দেখি, মনের নির্জন-গুহা হইতে কে বাহির হইয়া আসিল অশ্ব-সা[illegible] তারপর, ক্ষুরে ক্ষুরে তপ্ত বালু-ধূলি উড়িয়া চলিল। চলচ্চিত্রের ছায়া-ছ[illegible] অপরিচিত মরু পৃথিবী ও সম্মুখ-ভবিষ্যৎ কেবল পিছনে সরিয়া মিলাইয়া যাইতেছে এ[illegible] চোখের দৃষ্টির তল দিয়া। অশ্বারোহীর আর এক চোখে ধ্যান দৃষ্টি—সমস্ত সম্মুখের[illegible] পার হইয়া কোন অসীমের নীড়ে গিয়া নিবদ্ধ রহিয়াছে?

* * * * * *

অসমাপ্ত লেখা মাঝখানেই সমাপ্ত করিলাম। শরতের আকাশ আলোতে আমার শেষ-কথা জানাইবার এইতো শুভ-সময়—

"আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম,
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।"